পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তি
অদ্রীশ বর্ধন

প্রথম প্রকাশ - আনন্দমেলা

দুই সংখ্যায় প্রকাশিত

২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

০৪ অক্টোবর ১৯৮৯

পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তি

অদ্রীশ বর্ধন

"লোকটাকে দেখতে অবিকল ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন সিনেমার হাতেগড়া দৈত্যটার মতন। হাইটে যা একটু ছোট। তেমন হৃষ্টপুষ্টও নয়। কিন্তু মাথার গড়ন হুবহু বরিস কারলফের মাথার গড়নের মতন।" এই পর্যন্ত বলে দারুণ আওয়াজ করে নস্যি নিল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

আমি ব্যাজার মুখে চেয়ে রইলাম ওর দিকে। ইদানীং বড্ড বেশি নস্যি নিচ্ছে আমার এই খামখেয়ালি বন্ধুটি।

খুবই কড়া নস্যি নিশ্চয়। ঝাঁঝের চোটে জল এসে গেছে ইন্দ্রর

চোখে। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে আড়চোখে তাকাল আমার দিকে। বললে মুখটিপে হেসে, "আমার নস্যি নেওয়াটা তোর সহ্য হচ্ছে না বুঝতেই পারছি। কিন্তু কী করি বল?"

আমি বললাম, "কী করি মানে? নস্যি না নিলেই হল। কেউ তো মাথার দিব্যি দেয়নি।"

"তা দেয়নি। তবে কী জানিস, মাথাটাকে ঝাঁকুনি না দিলে মনে হয় যেন মরেই গেছি। অনেকদিন তেমন অ্যাডভেঞ্চার করাও হচ্ছে না। নস্যিই এখন একমাত্র ভরসা।"

সকালের রোদ জানলা দিয়ে এসে পড়েছে ইন্দ্রনাথের ফর্সা শরীরে। এতক্ষণ ডনবৈঠক করছিল। এই শীতেও তাই ঘেমে গেছে। হাতের আর বুকের মাস্‌ল আরও ফুলে উঠেছে। দু' চোখের শান্ত চাহনি কিন্তু একই রকম আছে। সুন্দর মুখখানা আর ওই চোখজোড়া দেখলে ওকে কবি অথবা শিল্পী ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, বিপদ আর অ্যাডভেঞ্চার শান্ত চেহারার এই মানুষটাকেই একেবারে পালটে দিয়ে যায়। তখন ওর দু চোখে হিরে ঝকঝক করে, হাতে-পায়ে বনমানুষের শক্তি ভর করে, গলায় বাঘ ডাকে।

খাটের ওপরেই বসে পড়লাম। ইন্দ্রনাথ চেককাটা লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরে নিয়ে ইজিচেয়ারে বসে বললে, "যা বলছিলাম। লোকটাকে দেখতে একটা ছোটখাটো দৈত্যের মতন।"

"এসেছিল কেন?"

"ওর ধারণা, কেউ ওর ওপর তুকতাক চালিয়ে যাচ্ছে।"

"তুই কি পালটা তুকতাকের মন্ত্র জানিস? তোর কাছে কেন? তুই তো গোয়েন্দা।"

"আমিও তাই বলেছিলাম। লোকটা বললে, 'আপনি রহস্য নিয়ে ভাবতে ভালবাসেন, তাই এসেছি আপনার কাছে। আমার জীবনটাই একটা রহস্য। 'লক্ষ হাতির' দেশের লোক আমি।' এই পর্যন্ত বলেই এই জানলাটা দিয়ে তাকিয়েই কীরকম যেন হয়ে গেল। চট করে উঠে পড়ে বললে, 'আজ আর নয়। কাল সকালে আসব, রাত হলেই ওদের উৎপাত বাড়ে।' বলেই পাঁই-পাঁই করে এমনভাবে পালাল, যেন ভূতে তাড়া করেছে।"

"ঘড়িতে তখন ক'টা বেজেছিল?"

"অত দেখিনি। তবে ঘটনাটা ঘটে সন্ধের দিকে। চাঁদের আলো আসছিল এই জানলাটা দিয়ে। এখন যেমন আসছে সূর্যের আলো। লোকটা দাঁড়িয়েছিল এই জানলাটার সামনেই। দেখতেই পাচ্ছিস, এখানে দাঁড়ালে সুভাষ সরোবরের গাছপালা দেখা যায়, লেকের জল দেখা যায়। লোকটা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠে পড়পড়িয়ে পালিয়ে গেল।"

আমি বললাম, "তা হলে ভূত নয়, কাউকে দেখেই পালিয়েছে।"

ইন্দ্রনাথ বললে, "যাই হোক, অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছি।"

আমি হেসে বললাম, "ইন্দ্র, তুই উড়োজাহাজে চাপলেই পারিস। ওরকম ঝুঁকি আর অ্যাডভেঞ্চার কোথাও পাবি না—যখন-তখন ভেঙে পড়তে পারে।"

রসিকতার মুডে নেই ইন্দ্রনাথ। অন্য সময় হলে মুখরোচক এই প্রসঙ্গটা নিয়ে বিরাট গল্পগাছা শুরু হয়ে যেত। সেদিন কিন্তু আনমনা হয়ে রইল, আমি চুপ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর ও বলল, "মৃগ, তুই ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করিস না, আমিও করি না। বিশ্বাস না করেও তুই গল্প লিখেছিস তাদেরকে নিয়েই, যাদের দেখা যায় না। তা হলে এরকম অ্যাডভেঞ্চারে দৌড়নোর ডাক যদি আমি পাই, আমিও বা যাব না কেন?"

আমি বললাম, "গল্প লিখি মজা করার জন্য। যারা পড়ে, তারাও মজা পাওয়ার জন্যই পড়ে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপার সেখানে নেই। তবে তোর কেসটা আলাদা। গোয়েন্দা হয়ে তুই যদি ভূতদের পেছনে দৌড়স, লোকে তোর নিন্দে করবে।"

রাগ করে বললে ইন্দ্রনাথ, "লোকের কথার ধার ধারি না। আমার মন যা চায়, তাই করেছি চিরকাল। লোকটার ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের তৈরি দানবের মতো মাথাখানা দেখবার পর থেকেই আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে অলৌকিক অ্যাডভেঞ্চার, 'ওরে আয়' 'ওরে আয়' 'ওরে আয়' বলে ডাক দিচ্ছে আমাকে।"

অট্টহেসে বললাম আমি, "নস্যি নিয়ে-নিয়ে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে কোনও কালেই পাত্তা দিতিস না। নিজের পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের ওপরেই ভরসা রেখেই চিরকাল চলেছিস। আজকের ইন্দ্রনাথ রুদ্র এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়কেই ঠিকমতো খাটিয়েই তৈরি হয়েছে।"

"মৃগ, এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়ই কি সব?"

"মানে?" অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম আমি। "কী বলতে চাস, খুলে বল ইন্দ্র। চোখ-কান -নাক- জিভ-চামড়া — এ ছাড়া আবার কী থাকতে পারে মানুষের? ল্যাজ? সে তো আমাদের আদিপুরুষ বাঁদরদের ছিল!"

আমি একটু ঝাঁঝালো হয়ে গেছিলাম এই কথাগুলো বলতে গিয়ে। ইন্দ্রনাথ আমার চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল।

তারপর বললে, "ক্রাইমের ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা আছে, আজ পর্যন্ত যেগুলোর কিনারা হয়নি। বিলেত-আমেরিকার দুঁদে অপরাধ-বিজ্ঞানীরা নাকের জলে চোখের জলে হয়েছেন।"

"সব সময়ে সব অপরাধের অপরাধী ধরা পড়ে না!"

"তা নয়, মৃগ, অপরাধী আসলে কে, অনেক সময়ে তাও জানা যায় না। এসব ক্ষেত্রে অপরাধের কিনারা হবে কী করে? আমি ভাবছি না, এমন অনেক ঘটনা ক্রাইম হিস্ট্রিতে লেখা হয়ে আছে, যা মাথা ঘুরিয়ে দেয়, ভেবে কূলকিনারা পাওয়া যায় না। আমেরিকায় একজন রজক খুন হয়েছিল তার নিজের ঘরে। দরজা বন্ধ ভেতর থেকে। দরজার মাথায় ছোট্ট একটা ঘুলঘুলি, বড় মানুষ গলতে পারে না। তাকে গুলি করা হয়েছে, খুব কাছ থেকে। শার্টে বারুদের ঝলসানি লেগেছে। কিন্তু শার্ট বা ভেতরের গেঞ্জি ফুটো হয়নি। শুধু চামড়া ফুটো হয়েছে। রিভলভার পড়ে রয়েছে পাশেই। ঘরের দরজা বন্ধ রয়েছে। কী বলবি? আত্মহত্যা?"

"অবশ্যই।" বললাম আমি।

"তাই যদি হয়, তা হলে নিজেকে গুলি করে মেরে ফেলার পর রজক কি দানো হয়ে জামাকাপড় পরে নিয়েছিল?"

"তা হলে কেউ ওকে গুলি করে জামাকাপড় পরিয়ে দিয়েছে।"

"পালাল কী করে? দরজা তো বন্ধ ভেতর থেকে।"

"দরজার ওপরকার ঘুলঘুলি দিয়ে," কাষ্ঠ হেসে বললাম আমি।

"সেখান দিয়ে বড় মানুষ গলতে পারে না আগেই বলেছি। একটা বাচ্চাছেলেকে তার মধ্যে দিয়ে ঠেলেঠুলে নামিয়ে দিয়েছিল পুলিশ। খুনি অত কষ্ট করতে যাবে কেন? সে তো খুন করে দরজা খুলেই পালাতে পারত?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "তা হলে তো রহস্যময় হয়ে দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা।"

"এরকম রহস্যময় কাণ্ড আরও আছে, মৃগ," বললে ইন্দ্রনাথ, "কথা তুললি বলে একটা উদাহরণ দিলাম। অজস্র ঘটনা আগেও ঘটেছে, এখনও ঘটছে। আমরা হাজার মাথা খাটিয়েও সেসবের

আদি-অন্ত রহস্য ধরতে পারি না।"

"কিন্তু হঠাৎ এই নিয়ে এত ভাবছিস কেন, ইন্দ্র, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন-মার্কা লোকটাকে দেখে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই বা সুড়সুড় করে উঠল কেন?"

খোঁচা মেরে বললে ইন্দ্রনাথ, "হে সাহিত্যিক বন্ধু, তুমি অন্তত এই ভুলটি কোরো না। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন নামটা দানবটার নয়, দানবকে যিনি বানিয়েছিলেন তাঁর নাম। আর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যদি হঠাৎ সুড়সুড় করে, আমার কিছু করার নেই। তবে লোকটা এসে গেছে, এখানেই আসছে। কীরকম অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে আসছে, তা জানা যাবে এক্ষুনি।"

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম বেঁটেখাটো নিরিমিষ চেহারার একটা লোক বেজির মতো খরখর করে ঢুকে পড়ল গেট পেরিয়ে!

যাচ্চলে! এই লোক বলে কিনা সে, লক্ষ হাতির দেশের লোক!

অজানা শক্তি

লোকটা চৌকাঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে আমার দিকেই তাকিয়ে রইল। যেন সে অনেকদিন ধরেই আমাকে চেনে-জানে, এমনি ভাবেই তাকিয়ে রইল। আমাকে এই প্রথম দেখেছে বলে চোখে-মুখে এতটুকু কুণ্ঠা নেই।

হাতজোড় করে নমস্কার করতে করতে বললে, "মৃগবাবু, নমস্কার। এইমাত্র যার কথা শুনছিলেন, আমিই সেই।"

আমি তো আমি, ইন্দ্রনাথ পর্যন্ত অবাক হয়ে গেল এই কথা শুনে। চোখ বড়-বড় করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বললে, "বোসবাবু, আপনি কী করে জানলেন এইমাত্র আপনার কথা হচ্ছিল? মৃগকে আপনি চেনেন?"

"আজ্ঞে না।" ঘরের ভেতর ঢুকতে-ঢুকতে বললেন রহস্যময় লোকটা, "মৃগবাবুকে কখনও দেখিনি। তবে ওঁর নাম শুনেছি। আরও ভাল করে শুনলাম একটু আগে। আমাকে ছোটখাটো দৈত্য বলুন আর যাই বলুন, আমি লোকটা কিন্তু একেবারে নিরীহ।"

এইবারে মুখ হাঁ হয়ে গেল ইন্দ্রনাথের। আমার মুখের অবস্থাটা দাঁড়িয়েছিল কীরকম, তা বলতে পারব না। সামনে আয়না থাকলে দেখতে পেতাম!

বোসবাবু একটা চেয়ারে বসলেন। আমি প্রচণ্ড অবাক হলেও লোকটার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত এই ফাঁকে খুঁটিয়ে দেখে নিলাম। পাঁচ ফুট হাইটও হবে কি না সন্দেহ। মাথার গড়নটা অদ্ভুত। খুলির ওপর দিক চ্যাপটা। খুলির পেছন দিকটাও চ্যাপটা, ঠিক যেন একটা চৌকোনা বাক্স। অল্প-অল্প চুল—কাঁচাপাকা। কপালের চামড়ায় অনেক ভাঁজ। চোখের দু' কোণের চামড়াতেও অনেক ভাঁজ। নাকের দু'পাশের চামড়াও ভাঁজ খেয়ে ধনুকের মতো বেঁকে নেমে এসেছে দু'ঠোঁটের দুই কোণ ঘিরে। দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার কামানো। গোটা মুখটা যেন তেল-চকচক করছে। তেল বেরোচ্ছে লোমকূপ থেকেই। তাই সারা মুখখানাকে একটু নোংরা-নোংরা মনে হচ্ছে। চোখ দুটো সামান্য কটা, বেড়ালের চোখের মতো একেবারে কটা নয়। চোখের গড়নটা দেখলেই বোঝা যায় চিনেম্যান অথবা মঙ্গোলিয়দের সঙ্গে বংশের পূর্ব-পুরুষদের একটা সম্পর্ক ছিল। এরকম চিনেম্যান-চিনেম্যান চোখ নদী-নালার দেশের বাঙালিদের মধ্যে একেবারেই দেখা যায় না। গায়ে তাঁর একটা ময়লা ভাঁজখাওয়া বুশ শার্ট, আর একটা ঢলঢলে তাকিয়ার খোলের মতন প্যান্ট।

আমি ঢোক গিললাম। তারপর নমস্কার করলাম। বললাম, "আপনার নমস্কারটা একটু দেরিতে ফিরিয়ে দিচ্ছি। কিছু মনে করবেন না। হ্যাঁ, একটু আগেই আপনার কথা শুনছিলাম ইন্দ্রনাথের কাছে। কিন্তু আপনি তা জানলেন কী করে? আড়ি পেতেছিলেন?"

জিভ বের করে দুই হলদেটে নোংরা দাঁত দিয়ে রীতিমত লম্বা সেই জিভটাকে কামড়ে ধরেই ছেড়ে দিয়ে বললেন বোসবাবু, "অত অসভ্য আমি নই। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম ওই লেকের পাড়ে। গাছের তলায়। চেয়ে ছিলাম অবশ্য এইদিকেই। ঠিক তক্ষুনি...কিছু মনে করবেন না সার, আমার এই ব্যাপারটা গোড়া থেকে যদি না শোনেন, বুঝতে পারবেন না, কেন আপনাদের কাছে দৌড়ে এসেছি। আমার ভেতরে আছে একটা অজানা শক্তি। আমি এমন কিছু লেখাপড়া শিখিনি, কিন্তু অদ্ভুত এই ক্ষমতাটা ভগবান আমাকে দিয়েছেন ছেলেবেলা থেকে। এই ক্ষমতা পেলে অন্য কেউ হয়তো রাজাবাদশা হয়ে যেতে পারত। কিন্তু আমি তা হতে চাই না, আমি চাই শুধু শান্তিতে থাকতে। তাও পারছি না। এ তো ক্ষমতা নয়, এ যে অভিশাপ। কী কুক্ষণে আমি গেছিলাম লাওসে, দেখেছিলাম পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তি। তারপর থেকেই শনি লেগেছে আমার পেছনে। ইন্দ্রনাথবাবু, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে, দূর থেকেই মারবে, আমার গায়ে ফুটো পর্যন্ত হবে না। কিন্তু আমি মরে যাব। ওরা ভয়ানক লোক। ওরাও যে একটা ভয়ঙ্কর শক্তিকে দখলে রেখেছে। বছরের পর বছর আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। একটা গল্পের বইয়ে আপনার নামটা পড়লাম দু' দিন আগে। লিখেছেন ইনি, মৃগবাবু। প্রকাশকের কাছে গিয়ে আপনার নাম-ঠিকানা জোগাড় করেই দৌড়ে এসেছিলাম কাল রাতে। কিন্তু ওরাও এসে গেছে গন্ধে-গন্ধে। তাই পালিয়েছিলাম। ইন্দ্রনাথবাবু, শুনবেন আমার আশ্চর্য কাহিনী? শুনবেন ব্যাঙ্ককের পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তির রহস্যকথা?"

বোসবাবু হাঁফাচ্ছিলেন শেষের দিকে। ভদ্রলোক খুবই ভয় পেয়ে রয়েছেন। এত কথা একটানা বলে যাওয়ার সময়ে তাঁর চোখে-মুখে ভয়ের যেরকম আনাগোনা দেখলাম, সেরকমটা ইচ্ছে করেও কেউ মুখে ফোটাতে পারে না।

তবে ওঁর একটা কথা শুনে আমি চেয়ে ছিলাম ইন্দ্রনাথের দিকে, ইন্দ্রনাথও চেয়ে ছিল আমার দিকে। উনি তড়বড় করে বলে গেলেন, ওঁকে মেরে ফেলা হবে দূর থেকে; গায়ে ফুটো পর্যন্ত হবে না, কিন্তু উনি মরে যাবেন।

ঠিক এই ধরনের কথাই তো একটু আগে বলছিলাম আমি আর ইন্দ্রনাথ। আমেরিকার সেই রজক খুন হয়েছিল বন্দুকের গুলিতে। জামা ঝলসে গিয়েছিল বারুদে। অথচ শার্ট আর গেঞ্জি ফুটো হয়নি, ছ্যাঁদা হয়ে গিয়েছিল শুধু বুকের চামড়া। আজও সে-রহস্যের সমাধান হয়নি।

বোসবাবু দেখছি ঠিক এই ধরনেরই সৃষ্টিছাড়া রহস্যের কথা বলছেন!

আমার চোখে-চোখে তাকিয়ে নিয়েই চুপচাপ বাকি কথাগুলো শুনে গেল ইন্দ্রনাথ। তারপর হাতের তালুতে নস্যি ঢালতে-ঢালতে বললে, "বলুন আপনার রহস্য গল্প, আমরা শুনতে চাই।"

হাত বাড়িয়ে বোসবাবু বললেন, কষ্টের হাসি হেসে, "একটু নস্যি দেবেন?"

দূরের ছবি মনের চোখে

"আমার নাম ভিভিয়ান বোস নয়। আমার বাবা আর মা কোনওকালেই বোস ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন পল। মাইকেল পল আমার বাবার নাম। মা শ্যামদেশের মেয়ে।

"আমি জন্মেছিলাম বর্মার রেঙ্গুন শহরে। আমরা খ্রিস্টান। মাকে আমার মনে নেই। মা মারা যান আমার একুশ দিন বয়সে। তারপর

থেকে এ-বাড়ি ও-বাড়ি করে পাঁচ বছর কাটিয়েছি। বোর্ডিং হাউসে ভর্তি হলাম তারপর। ছুটিছাটার দিনেও বোর্ডিং-এ থাকতাম। বাবা এসেও আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারতেন না। যেতে ইচ্ছে করত না।

"বর্মায় যখন বোমা পড়ে, তখন আমার বাবা মারা যান বোমার টুকরোয়। আমি পালিয়ে আসি। কিছুদিন ছিলাম কাঁচরাপাড়ায়। নীলমণি বোসের বাড়িতে। গভর্নমেন্ট আমাকে তিনদিনের মধ্যে ইণ্ডিয়া ছেড়ে যেতে বলেছিল একটা মিথ্যে ব্যাপারে। নীলমণি বোস বললেন, 'আজ থেকে তুমি পল নও, বোস হয়ে যাও। তা হলে আর কে ধরবে ? চলে যাও কলকাতায়।'

"সেই থেকে আছি কলকাতায়। খুবই কষ্টে। থাক সে কথা। শুনুন, এবার আমার ভেতরকার অদ্ভুত শক্তিটার কথা। আজগুবি মনে হতে পারে। কিন্তু প্রমাণ দেব।

"মায়ের কথা আমার মনে নেই। মায়ের ছবি পর্যন্ত দেখিনি। মায়ের জন্য মন কেমনও করে না। বাবা একাই মায়ের আদর দিয়ে গেছেন। নিজেকে কক্ষনো একা মনে হত না। এমনকী বাবা যখন আমাকে বাড়িতে রেখে দরজার বাইরে থেকে তালা দিয়ে চলে যেতেন কাজে, তখনও মনে হত, বাবাকে ডাকলেই দৌড়ে আসবেন। এরকম মনে হওয়ার একটা কারণ আছে। বাবাকে আমি দেখতে পেতাম। প্রথম-প্রথম চোখ বন্ধ করে বাবার কথা ভাবলেই, বাবাকে দেখতে পেতাম কাঠগোলায় কাজ করছেন। কখনও দেখতাম নদীর ধারে কাঠের গুঁড়ি গুনছেন। তারপর থেকে এমনই হল যে, চোখ চেয়ে থেকেই দেখতে পেতাম বাবাকে। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আর ঠিক যেন ছবি ফুটে উঠত দেওয়ালে।

"আমার তখন এত কম বয়স, এটা যে একটা অলৌকিক ক্ষমতা, তা বুঝতে পারতাম না। বাবা বাড়ি ফিরে এলে গল্প করতাম। সারাদিন বাবা কী করেছেন, কোথায় ছিলেন, স-ব বলতাম। বাবা অবাক হতেন। ভয় পেতেন। বলতেন, 'আর কাউকে বলিসনি, মাইকেল।'

"কেন অত ভয় পেতেন, তখন বুঝতাম না। পরে জেনেছিলাম। ডাইনি সন্দেহ করে কতজনকে তো পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। দূরের জিনিস আমি দেখতে পাই জানাজানি হয়ে গেলে যদি আমাকে মেরে ফেলে ? বাবা ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতেন এই কারণেই।

"একদিন আমার এই আশ্চর্য ক্ষমতাটা আর-একটু বেড়ে গেল আমি নিজেই ভয় পাওয়ার পর। বাড়িতে একলা থাকতাম ঠিকই, কিন্তু কোনও অসুবিধে হত না। খাবারদাবার সাজিয়ে রেখে যেতেন বাবা। দরজা বন্ধ থাকত বাইরে থেকে। আমি খেলনা, বই নিয়ে ভুলে থাকতাম।

"একদিন কিন্তু ভয় পেলাম প্রচণ্ড। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছিলাম বাগানের ফুল আর পাখি। এমন সময়ে একটা ইঁদুর লাফ দিয়ে এসে পড়ল জানলার গোবরাটে, সেখান থেকে আর-একটা লাফ দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকবার আগেই ভীষণ বেগে কী যেন একটা ছিটকে এল জানলার দিকে। বাগানের মাটি থেকে জানলার গোবরাট অনেকটা দূরে। এতটা পথ যা ছিটকে এল প্রথমে তাকে দেখতেই পাইনি। মনে হয়েছিল যেন একটা কালো রেখা বাগান থেকে গোবরাট পর্যন্ত আচমকা শূন্যে তৈরি হয়ে শূন্যেই মিলিয়ে গেল।

"আর তারপরেই ইঁদুরটার আর্তনাদ শুনেই চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল আমার। এত বড় মাকড়সা জীবনে দেখিনি। আটখানা পায়ে লম্বা-লম্বা কালো লোম। চোখ দুটো চুনি-পাথরের মতো লাল। জানলার দুটো গরাদের মধ্যে যতটুকু ফাঁক, তার চাইতেও

বড়। ধড়খানা আমার এই মুঠোর সমান। ইঁদুরটার ঘাড়ে দুটো হুল ফুটিয়ে দিয়ে সে পা দিয়ে তাকে ধরে রেখেছে।

"আমি মাত্র হাতখানেক দূর থেকেই ভয়ঙ্কর সেই মাকড়সাকে দেখে বিকট চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। মাকড়সা চেঁচানি শুনতে পায় কি না জানি না, কিন্তু আমার চিৎকারের সঙ্গে-সঙ্গে ইঁদুরটাকে নিয়েই লাফ দিয়ে নেমে গেল বাগানে। আমিও দড়াম করে জানলার কপাট বন্ধ করে দিয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম বিছানায় বসে।

"একটু পরেই শুনলাম তালা খোলার আওয়াজ। আওয়াজ শুনেই বুঝলাম, বাবা এলেন। কিন্তু বাবা তো এত তাড়াতাড়ি ফেরেন না। আমি উঠে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই বাবা দৌড়ে এলেন। আমাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, 'খুব ভয় পেয়েছিস? আর জানলা খুলিসনি। আজই নির্বংশ করব ওদের।'

"'কাদের?' ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছিল প্রশ্নটা।

"'মাকড়সাদের।'

"'তুমি জানলে কী করে?'

"' আমি যে দেখতে পেলাম ভীষণ ভয় পেয়েছিস। চোখ বড় বড় করে জানলার দিকে তাকিয়ে আছিস। ইঁদুরটাকে নিয়েই লাফিয়ে নেমে গেল বাগানে। ভাগ্যিস তোকে হুল ফোটায়নি।'

"'তুমি দেখতে পেলে?'

"অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন বাবা। আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'এতদিন জানতাম শুধু তুই একা দেখতে পাস, আজ জানলাম, আমাকেও দেখাতে পারিস দূরের জিনিস।'

"সেইদিন খুব ভয় পেয়েছিলাম, তাই মনের শক্তি যেন ফেটে পড়েছিল। বাবার মনকে ছুঁয়েছিল অত দূরেও। এমন ঘটনা অবশ্য সবসময় ঘটে না। ইচ্ছা করলেই আমি যা দেখেছি, তা আর-একজনকে দেখাতে পারি না। যেমন ধরুন, এই মুহূর্তে আপনাকে দেখাতে পারছি না একটা যমদূত এগিয়ে আসছে আপনার দিকে। ইন্দ্রনাথবাবু, আপনি গুলি ছুঁড়তে পারেন?"

চোখ কুঁচকে বোসবাবুর কথা শুনছিল ইন্দ্রনাথ, জানলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। আমি বসে ছিলাম ডান দিকের দেওয়ালের গায়ে সোফার ওপর। বোসবাবু জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থেকেও জানলার দিকে চোখ না তুলে শেষ প্রশ্নটা একটু উদ্বেগের সুরে বলার সঙ্গে-সঙ্গে চট করে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। ঘুরে দাঁড়িয়ে জানলার মধ্যে দিয়ে সুভাষ সরোবরের হাওয়ায় উদ্দাম গাছপালার দিকে তাকিয়ে বললে, "কই, কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না।"

বোসবাবু এবার উঠে দাঁড়ালেন। চিনেম্যান টাইপের ছোট কটা চোখ দুটোয় ভয়ের চিহ্ন দেখলাম স্পষ্ট।

বললেন দ্রুত স্বরে, "রিভলভার! রিভলভার! প্লিজ! দূর থেকেই গুলি করে উড়িয়ে দিতে হবে। চোখের পাতা ফেলবার আগেই..."

অদ্ভুত চেহারার এই লোকের কথায় ইন্দ্রনাথের মতন ডাকাবুকো মানুষ তৎপর হবে ভাবতেও পারিনি। আমি যদি ইন্দ্রনাথের জায়গায় থাকতাম, তা হলে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকতাম, রিভলভার-টিভলভার আনতে যেতাম না।

কিন্তু আমার এই বন্ধুটির ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মাঝেমধ্যে মাথাচাড়া দেয়। সেই মুহূর্তেও দেখলাম, চোখের পলক ফেলার আগেই ও হেঁট হয়ে সোফার কুশনের তলা থেকে টেনে বের করল ওর রিভলভার। অথচ রিভলভার রাখার জায়গা ওটা নয়। আগে থেকেই কি তা হলে তৈরি হয়েছিল ইন্দ্রনাথ? বোসবাবু কি ওঁর অলৌকিক শক্তি দিয়ে স্পর্শ করেছেন ইন্দ্রনাথের হুঁশিয়ারি সত্তাকেও?

এত কথা তখন ভাববার অবসর পাইনি। এর পরের ঘটনাগুলো এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে, ভাল করে দেখতেও পেলাম না। শুধু এইটুকু দেখলাম যে, একটা ধ্যাবড়া কালো মতো কী জিনিস বাইরে থেকে আচমকা আবির্ভূত হল জানলার দুটো গরাদের ফাঁকে এবং পরমুহূর্তেই পিস্তলের গর্জনের সঙ্গে-সঙ্গে তা ছিন্নভিন্ন হয়ে ছিটকে গেল জানলার বাইরে।

ইন্দ্রনাথ ফুঁ দিয়ে বাকি ধোঁয়া উড়িয়ে দিল রিভলভারের নলচে থেকে। তারপর একটুও না হেসে বোসবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, "টিপখানা কীরকম দেখলেন?"

ফের চেয়ারে বসে পড়ে বললেন বোসবাবু, "চমৎকার। এবার নিন আমার শক্তির পরীক্ষা। এইমাত্র যাকে গুলি করে উড়িয়ে দিলেন, সে কে জানেন?"

"আপনিই বলুন," রিভলভারটাকে সোফার কুশনের তলায় রাখতে রাখতে বললে ইন্দ্রনাথ।

"যার ইঞ্চিখানেক লম্বা দুটো হুলের বিষে মানুষ মারা যেতে পারে, চলবার সময়ে যার গায়ের লোমের ঘষাঘষিতে খস্‌খস্ আওয়াজ হয়, ওজন যার সাড়ে তিন আউন্স..."

"এবং যার এক ঠ্যাং-এর ডগা থেকে আর-একটা ঠ্যাং-এর ডগা পর্যন্ত মাপলে দাঁড়ায় পাক্কা এগারো ইঞ্চি," এতক্ষণে মৃদু হাসি ভাসল ইন্দ্রনাথের পাতলা সুন্দর ঠোঁটে।

বোসবাবুর কটা চোখ দুটো বড় হয়ে গেল এই কথায়, "ক'টা ঠ্যাং বলুন তো?"

"আটটা।"

"এইটুকু সময়ের মধ্যে দেখলে কী করে?"

"গোয়েন্দার চোখ দিয়ে," ইন্দ্রনাথের চোখে-মুখে এখন হাসি। এ-হাসি এমনই হাসি, যার মানে আমিও ছাই বুঝি না। এ-হাসি যখনই হাসে ইন্দ্রনাথ, তখনই কিন্তু জবর রহস্যের গোলকধাঁধায় তলিয়ে যায় মনে-মনে। এ-আমি অনেকবার দেখেছি। একটু থেমে ফের বলল, ও,"আপনার অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েও দেখিয়ে দিতে পারেন, সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে আমার মনে হচ্ছে, এই মাত্র যে তেড়ে এসেছিল আমার পিঠে লাফিয়ে পড়বে বলে, সে হয়তো র‍্যাম্‌বো স্বয়ং।"

"র‍্যামবো!" অস্ফুট গলায় বলে উঠেছিলাম আমি।

হেঁয়ালির হাসি হাসতে-হাসতে বললে ইন্দ্রনাথ, "ভায়া মৃগাঙ্ক, র‍্যাম্‌বো মানে সিনেমার দাঙ্গাবাজ র‍্যাম্‌বো হিরো নয়। একে বলা যায় মাকড়সাদের র‍্যাম্‌বো!"

"মাকড়সাদের র‍্যাম্‌বো!"

"টারানটুলা মাকড়সাও এর কাছে শিশু। এর নাম বর্জিয়া। নামটা মনে রেখো মৃগ, বর্জিয়া জামা ফুটো না করেও তোমার চামড়া ফুটো করে ছাড়তে পারে। কলারের ফাঁক দিয়ে বুকে-পিঠে চলে যেতে পারে। সাপকেও যারা সমীহ করে না, তারা আঁতকে ওঠে বর্জিয়ার সামনে। কিন্তু বোসবাবু, দক্ষিণ আমেরিকার গুয়ানা জঙ্গলে যার নিবাস, সে সুভাষ সরোবরের পাশের এই বাড়িতে এল কী করে?"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বোসবাবু বললেন, "আশ্চর্য মানুষ তো আপনি? র‍্যাম্‌বোকে না দেখেই এত কথা বলে গেলেন? আমি কিন্তু মনের চোখ দিয়ে আগেই দেখতে পেয়েছিলাম ও আসছে, জানলার দিকে লাফাতে যাচ্ছে..."

"আমিও দেখেছিলাম। আপনার চোখের মধ্যে দিয়ে।" বোসবাবুর কটা চোখের দিকে তাকিয়ে দুর্জ্ঞেয় হাসি হেসে বলে গেল ইন্দ্রনাথ।

"আশ্চর্য! চলুন, গিয়ে দেখা যাক র‍্যাম্‌বোর লাশ।"

কিন্তু আরও আশ্চর্য ব্যাপারটা দেখা গেল বাইরে গিয়ে। র‍্যাম্বোর দেহের কিছু অংশ ছড়িয়েছিটিয়ে পড়ে আছে বটে, সাড়ে তিন আউন্স ওজনের বপুটা নেই!

শূন্যে মিলিয়ে গেল নাকি?

কলসির মাঠে দৈত্যদের উনুন

ঘরে ফিরে এলাম যখন, সূর্য তখন মাথার ওপর। বোসবাবুর চকচকে মুখে ঘামের ফোঁটা। ধূসর চোখে আতঙ্ক।

বললেন ফ্যাসফেসে গলায়, "দেখলেন সার, দেখলেন কাণ্ডটা। এক্কেবারে ভোজবাজির মতো মিলিয়ে দিল।"

"কারা মিলিয়ে দিল, মিঃ পল?" চোখের তারা দুটোকে ছুঁচের মতো সরু করে এনে জিজ্ঞেস করল ইন্দ্রনাথ।

কটা চোখ নাচিয়ে বললেন বোসবাবু, "পল নয়, পল নয়। আমাকে বোসবাবু বলেই ডাকবেন।"

"বেশ তাই হোক, তাই হোক। এখন বলুন, বর্জিয়াকে অদৃশ্য করল কারা?"

"তারা, যারা পাঠিয়েছিল ওকে।"

"তারা কারা?"

"সেইটা বলতে দিল কই? আগেই পাঠিয়ে দিল যমদূতটাকে। এবার বলি!"

"বলুন।"

"আগেই বলেছি, মা ছিলেন শ্যামদেশের মেয়ে। যে দেশের নামডাক লাখ-লাখ হাতির জন্য। মায়ের বাবা থাকতেন লাওসদেশে। শ্যামদেশের ঠিক পাশের দেশ। যে-দেশের একদিকে চিন, একদিকে ভিয়েতনাম, আর-একদিকে ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশ।

"লাওসের আদিবাসীদের সংখ্যা কম নয়। এদের মধ্যে লাও থিয়াঙ্-রা থাকে পাহাড়ি অঞ্চলে। আমার দাদামশাই ছিলেন লাও থিয়াঙ্। তাঁর বাপ-ঠাকুর্দারা রাজা। সামসেনথাই-এর আমল থেকে রাজাদের সেবা করে এসেছেন। বাবার মুখে শুনেছি, রাজারা এঁদের এত মণিমাণিক্য দিয়েছিলেন, যা একজায়গায় রাখলে ছোটখাটো একটা পাহাড় হয়ে যায়। ওঁরা কিন্তু যত জহরত পেয়েছিলেন, তার বিনিময়ে পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তিই সঞ্চয় করে গেছেন। বংশ পরম্পরায় সঞ্চিত পান্না-বুদ্ধদের মোট সংখ্যা কত, তা সঠিক কেউ জানে না। কেউ বলে এক হাজার, কেউ বলে হাজার-হাজার।

"পান্না-বুদ্ধরাই শেষ পর্যন্ত কাল হয়ে দাঁড়াল। খোদ রাজপরিবারের নজর পড়ল বিখ্যাত এই কালেকশনের দিকে, আমার দাদামশাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে নিদারুণ অত্যাচার করে পিটিয়ে মেরে ফেলার পরেও তিনি বলে গেলেন না, কোথায় রেখেছেন অত পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তি। তাঁর প্রাসাদ তন্ন-তন্ন করে দেখা হল, বলতে গেলে প্রত্যেকটা পাথর খুলে পান্না-বুদ্ধদের খোঁজ করা হল। কিন্তু পাওয়া গেল না কাউকেই।

"এই সব কাণ্ড ঘটবার আগেই আমার মা পালিয়েছিলেন বাড়ি ছেড়ে এবং দেশ ছেড়ে। বর্মায় এসে নিজের পরিচয় লুকিয়ে কী কষ্টে যে দিন কাটিয়েছেন, তা আর বলবার নয়। তারপর ঠাঁই পান একটা খ্রিস্টান মঠে।

"এসব গল্প শুনেছি বাবার কাছে। একটা কথা বেশ মনে আছে, কলসির মাঠে দৈত্যদের উনুন। আমার মা মারা যাবার ঠিক আগে এই কথাটাই বিড়বিড় করে বলেছিলেন। স্পষ্ট শুনেছিলেন আমার বাবা। কলসির মাঠে দৈত্যদের উনুন বলতে কী যে বোঝাতে চেয়েছিলেন আমার মা, তা জিজ্ঞেস করার আগেই মা আমার চলে যান পৃথিবী ছেড়ে।

"তারপর থেকেই বাবা হিমশিম খেয়ে গেছেন আমাকে মানুষ করতে গিয়ে। রীতিমত গতর খাটিয়েছেন। পান্না-পাথরের বুদ্ধদের নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় এক্কেবারে পাননি। তবে বাড়ি ফিরে অনেক রাতে আমাকে ঘুম পাড়ানোর সময়ে অনেক রূপকথা-উপকথার গল্প বলে যেতেন, ফাঁকে-ফাঁকে বলতেন লাওসের গল্প, শ্যামদেশের গল্প, লক্ষ হাতির গল্প, আর কলসির মাঠে দৈত্যদের উনুনের গল্প।

"বর্মায় বোমা পড়তেই বাবাও আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন স্বর্গে। আমি পালিয়ে এলাম কলকাতায়। তারপর গেছে বেশ কয়েকটা বছর। মাঝে ছিলাম দার্জিলিঙের একটা খ্রিস্টান মঠে। সেইখানে দেখা হল শেরপা থুঙ্-এর সঙ্গে।

"লোকটা যে পয়লা নম্বরের খুনে-বদমাশ, আগে তা বুঝিনি। এমন মিঠে-মিঠে কথা বলত, এমন মিষ্টি-মিষ্টি চোখে তাকাত যে, তার কাছে মনের আগল খুলে কথা না বলে পারতাম না। এইরকম আলগা মনের আলটপকা কথা বলার সময়েই ফাঁস হয়ে গিয়েছিল আমার মনের আশ্চর্য ক্ষমতার ব্যাপারটা। আমি দূর থেকে দেখতে পাই, সেরকম বিপদ এলে অন্যকেও দেখাতে পারি, এইসব কথা শুনে শেরপা থুঙ্ আমাকে ভুজুংভাজুং দিয়ে নিয়ে গেল শ্যামদেশে, শ্যামদেশ থেকে লাওসে। উদ্দেশ্য ছিল খুবই খারাপ, ওদেশে টহল দিতে-দিতে নিশ্চয় একদিন মনের চোখে দেখতে পাব বুদ্ধমূর্তিদের। পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেছে হাঁটতে হাঁটতে, খিদেয় নাড়ি চনচন করেছে, তবুও কিচ্ছু দেখতে পাইনি। শেষকালে বদমাশ শেরপা থুঙ্ আমাকে ভয় দেখাতে শুরু করল। এককালে নিজে ছিল সাউথ আমেরিকার গুয়ানা জঙ্গলে। সেখান থেকে পেল্লায় মাকড়সাদের ধরে এনে দুটো আলাদা বাক্সে রেখে দিত। একটা মেয়ে আর একটা পুরুষ। বাচ্চাগুলো বড় করে তুলত আর-একটা বাক্সে। মেয়ে-মাকড়সারা যখন ছেলে-মাকড়সাদের ধরে-ধরে খেত, আমাকে জোর করে দেখাত ভয়ানক দৃশ্য। ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেত। কিন্তু কিছুতেই মনের চোখে দেখতে পেতাম না, কোথায় আছে মামারবাড়ির পান্না-বুদ্ধরা।

"এই সময়ে একটা বেফাঁস কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। রাজা প্রথমরাম ব্যাঙ্ককে নিজের রাজনগরে যে বিশাল বুদ্ধমূর্তিটা বসিয়েছিলেন, সেটা যে আসল নয়, নকল, তা একনজরেই আমি টের পেয়েছিলাম। আচমকা তা মুখ দিয়ে বেরিয়েও গিয়েছিল। পাজির পাঝাড়া শেরপা থুঙ্ তা শুনে ফেলে কী অত্যাচারই না চালিয়ে গেল আমার ওপর। আমি কিন্তু জানলেও বলিনি কোথায় লুকনো আছে পান্না-পাথরের আসল বুদ্ধমূর্তি।"

পান্না-পাথরের পাকচক্র

ইন্দ্রনাথের খিদে পেয়েছিল নিশ্চয়। আমারও পেটে ইঁদুর ডন মারছে মনে হচ্ছিল। কিন্তু দু'জনের কেউই হেঁশেলের দিকে উঠে যাইনি গল্পে জমে যাওয়ায়। চৌকো মাথা নেড়ে-নেড়ে গল্প বলতেও পারেন বটে বোসবাবু।

তাই দম নেওয়ার জন্য যেই উনি থেমেছেন, অমনি টপ করে উঠে পড়ে হেঁশেল থেকে বিস্কুট আর মাখনের কৌটো এনে নিচু টেবিলে রেখে বললে ইন্দ্রনাথ, "বেড়ে গল্প জমিয়েছেন, বোসবাবু, নিন, দুটো বিস্কুট খেয়ে পিত্তি রক্ষা করুন। পেট চুঁইচুঁই করছে না?"

"নাঃ," বলে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন বোসবাবু, "দিন দিন,

তবুও খাই। কতদিন কেউ এভাবে খেতে দেয়নি।"

একমুঠো মোটাসোটা বিস্কুট বোসবাবুর হাতে গছিয়ে দিয়ে মাখনের টিনটা সামনে ঠেলে দিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ, "এরপর দেব দুধ। খেতে-খেতেই গপ্পো চালিয়ে যান। ব্যাঙ্ককের বিখ্যাত পান্না-বুদ্ধ তা হলে আসল নয়?"

"একেবারেই নয়," গায়ে-গতরে ভারী তিনখানা বিস্কুট একসঙ্গে মুখে চালান করে দিয়ে খড়মড় করে চিবোতে-চিবোতে বললেন বোসবাবু। তারপরেই ঘ্যাঁচ করে এক আঙুল মাখন তুলে মুখে পুরে চুষতে-চুষতে শেষ করলেন আধবোজা চোখে, "ওয়াট ফারা কেও বৌদ্ধমঠে যা আছে, তা জাল মূর্তি। বুরবক বনে যাচ্ছে হাজার-হাজার ট্যুরিস্ট।"

"বলেন কী!" ধীরে সুস্থে একটা বিস্কুটে কামড় দিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ, "আসল বুদ্ধ তা হলে গেল কোথায়?"

"কোথায় আবার যাবে," উদাসভাবে চোখ বন্ধ করে ফেলে বললেন বোসবাবু। সারা মুখের অজস্র চামড়ার ভাঁজে অসংখ্য ঢেউ খেলে যেতে লাগল, চোয়াল নেড়ে-নেড়ে বিস্কুট চিবনোর সঙ্গে-সঙ্গে। "আছে শ্যামদেশেই, না, না, সরি, তার পাশেরই একটা দেশে।"

"পাশের দেশে! পাশে তো তিনটে দেশ আছে। বর্মা, লাওস আর চিন। কোনটার কথা বলছেন?"

এবার পুরোপুরি খুলে গেল বোসবাবুর দু' চোখের পাতা। কটা রঙের চোখে নিমেষে খেলে গেল ধূর্ততার ঝিলিক।

বললেন থেমে-থেমে, "এখন বলব না। শেরপা থুঙ্ ব্যাটা ঠিক শুনতে পাবে।"

"এখানে সে কোথায়?"

"আছে, আছে, বদমাশটা সব জায়গায় আছে, সবরকম ভাবে আছে। ওর আকাশে কান আছে, বাতাসে কান আছে। শুনতে চান কেন? দেখিয়ে দেব।"

"দেখিয়ে দেবেন? কোথায়?"

"যেখানে আছে আসল পান্না-বুদ্ধ, যেখানে আছে হাজার-হাজার মামাবাড়ির বুদ্ধ। যাবেন? নিয়ে যাবেন আমাকে?"

স্থির চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে ইন্দ্রনাথ, "হ্যাঁ যাব।"

পেট-কাটা মেয়েটা

তাই আমরা এসেছি লাওসে।

দমদম এয়ারপোর্ট থেকেই গাঁইগুঁই শুরু করেছিলাম আমি। "যাওয়ার কথা তো শ্যামদেশে, যাচ্ছি কিন্তু লাওসে। কেন?"

তেরিমেরি গলায় বলে উঠেছিলেন বোসবাবু, "দুর মশাই, অত ফ্যাচ-ফ্যাচ করছেন কেন? চুপ করে থাকুন না।"

আহত গলায় বলেছিলাম, "আর-একটু ভাল গলায় জবাবটা দিলে হত না। যাচ্ছি অনেক দূর দেশে। কতদিন একসঙ্গে ঘুরতে হবে আপনি জানেন না, আমিও জানি না। গোড়াতেই মেজাজটা মাটি করে দেবেন না।"

অমনি সারামুখে চামড়ার ভাঁজগুলোয় হাজারখানেক হিল্লোল তুলে হেসে উঠলেন বোসবাবু, "রাগ করবেন না, রাগ করবেন না। অ্যাংজাইটি আর টেনশনে আমার নার্ভের দফারফা হয়ে গেছে। ওই ব্যাটা শেরপা থুঙ্ যদি শুনে ফ্যালে কোথায় যাচ্ছি..."

"কোনও শেরপারই টিকি দেখা যায়নি আজ পর্যন্ত।"

"সেইজন্যেই তো ভয়ে সিঁটিয়ে আছি। ব্যাটা যদি আবার একখানা র‍্যাম্বো ছেড়ে দেয়..."

"এখন আর ছাড়বে না। বুদ্ধমূর্তিদের সামনে পৌঁছলেই কিন্তু বাক্সগুলোই উপুড় করে ধরবে আপনার মুখের ওপর।"

সঙ্গে-সঙ্গে বোসবাবুর মুখের রং পালটে গেল। মুখের ওপর কিলবিলে মাকড়সাদের অনুভব করেই যেন কীরকম হয়ে গেলেন। মনে হল এই বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

ইন্দ্রনাথ পাশ থেকে গা টিপে দিয়ে বললে নরম গলায়, "ঘাবড়াবেন না, আমি আছি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি আছেন, " ঢোক গিলতে-গিলতে বললেন বোসবাবু, "আপনার গুলি ফসকায় না। দেখলাম তো চোখের সামনেই।"

অনেক রকম কলকাঠি নেড়ে বিদেশ যাওয়ার হাজার বেড়াজাল পাশ কাটিয়ে ইন্দ্রনাথ আমাকে আর বোসবাবুকে এনে ফেলেছে লাওসে। নিদারুণ অ্যাডভেঞ্চারের লোভে আমিও টাকা ওড়াচ্ছি দেদার। মাঝেমধ্যেই এমনই করি আমি। জমানো টাকায় ময়লা জমতে দিই না। টিকটিকি বন্ধু ইন্দ্রনাথও কম যায় না। মাথা খাটিয়ে চোর-ডাকাতদের শায়েস্তা করে রোজগার করে যেমনই, খোলামকুচির মতো টাকাও ওড়ায় তেমনই। তা ছাড়া, বিয়ে-থা করেনি। অ্যাডভেঞ্চার ছাড়া জীবনে কোনও নেশা নেই। তা না হলে মাইকেল পল ওরফে বোসবাবুর পিলে-চমকানো কাহিনী শুনে এতদূর কেউ দৌড়ে আসে?

টাকা ওড়াচ্ছি শুধু আমরা দু'জনেই, হাত উপুড় করছেন না বোসবাবু। কাটা রেকর্ডের মতো একটা কথাই তিনি বলে যাচ্ছেন বারবার, "সুদে-আসলে সব ফিরিয়ে দেব, মশাই। একবার শুধু নিয়ে চলুন আমাকে পান্না-বুদ্ধদের সামনে।"

"সেটা কোথায় তা বলবেন তো?"

এ-প্রশ্নটা শুধু আমিই করে গেছি, ইন্দ্রনাথ মুখে চাবি দিয়ে থেকেছে। মুখনাড়া খেয়েছি প্রতিবারেই। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের হাতে গড়া দৈত্যের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে বিড়াল-চোখ নাচিয়ে-নাচিয়ে বোসবাবু দিয়ে গেছেন একটাই জবাব, "না আঁচালে বিশ্বাস নেই। আগে দেখি আমার মন যা জেনেছে তা সত্যি কি না, বলব তারপর।"

জ্বালা বটে!

পলকে পলকে মেজাজ খিচড়ে যাচ্ছে আরও একটা কারণে। পুরো ট্যুর প্রোগ্রামটা কনডাক্ট করে যাচ্ছেন বোসবাবু একাই। আমরা দুই বন্ধু কেবল কাঁড়িকাঁড়ি টাকাই খরচ করে যাচ্ছি। কিছু বলতে গেলেই ইন্দ্রনাথ আমার গা টিপে দিয়ে আড়ালে-আবডালে বলছে, "চুপ করে থাক না? ব্যাপারটা খুব মিস্টিরিয়াস।"

"ধুত্তোর মিস্ট্রি!" তেড়েমেড়ে জবাব দিয়ে গেছি আমিও, "কেন যাচ্ছি, শুধু এইটুকু ছাড়া কোথায় যাচ্ছি, কী ভাবে যাচ্ছি কিছুই জানছি না..."

"সেটাও তো একটা মিস্ট্রি," মুচকি হেসে বলেছে ইন্দ্রনাথ, "বোসবাবুর মনের ক্ষমতার প্রমাণ তো পেয়েছিস? বেশি জানতে চাসনি, আবার র‍্যাম্বো তেড়ে আসবে!"

ফলে গজগজ করেই শুরু হয়েছে আমার আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চার। আশ্চর্য বলে আশ্চর্য! ইন্দ্রনাথের পাল্লায় পড়ে প্রাণটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে হয়েছে অনেকবার। কিন্তু এরকম রহস্য, এরকম চমক, আর এরকম দিশেহারা কাণ্ডকারখানায় কখনও পড়িনি।

তবে হ্যাঁ, লাওসের কোনও অজ পাড়াগাঁ থেকে শুরু হয়নি বিচিত্র এই পর্যটন-পর্ব, প্লেন থেকে নেমেছি এক্কেবারে রাজধানীতে, যার নাম

ভিয়েনতিয়ানে। প্রথম প্রথম আমার নিজেরও গুলিয়ে যাচ্ছিল ভিয়েতনাম আর ভিয়েনতিয়ানে নাম দুটোর মধ্যে। তারপর মুখস্থ হয়ে গেছে ভিয়েনতিয়ানে নামটা। লাওসের রাজধানী ভিয়েনতিয়ানে। ভিয়েতনাম দেশটা রয়েছে লাওসের ঠিক পাশে। একডজন বছর ধরে রাশিয়া আর আমেরিকার রাজনীতির লড়াই চলেছিল যে দেশে, আমি এসে দাঁড়িয়েছি সেই দেশের রাজধানীতে।

লাওস। রাজাদের আমল গেছে, এখন মার্ক্সসিস্ট লেনিনিস্ট রাজত্ব দেশজোড়া মানুষের মনে আশা আর মুখে হাসি এনে দিয়েছে। এতদিন যে দেশ 'মুয়ান' অর্থাৎ স্রেফ আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে মশগুল হয়ে ছিল—এখন সেখানে কাজের জোয়ার এসেছে।

মেকং নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে এইসব কথাই ভাবছিলাম, অনেকদিন পর বেরিয়েছি বাংলার বাইরে, ভারতের বাইরে এই প্রথম, কিন্তু কেন জানি না মনে হচ্ছে, দাঁড়িয়ে রয়েছি ভারতের মাটিতেই। গঙ্গার জল দেখছি মেকং নদীর বুকে!

"সঙ্ কাবোই ?" কানের কাছে হঠাৎ বিদঘুটে দুটো শব্দ শুনেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখেছিলাম বছর নয়েক বয়সের একটি লাও মেয়েকে। পুরু ঠোঁট দুটোয় যেন রাজ্যের অভিমান। ছোট-ছোট দুটো চোখের একটায় পাথরের চোখ বসানো। হলুদ রঙের ফ্রকটা গুটিয়ে পেটের ওপর তুলে রেখেছে বলে দেখা যাচ্ছে তার লম্বালম্বিভাবে কাটা-পেটের সেলাই। চামড়া গুটিয়ে গিয়ে জোড়া লেগেছে। দু' হাতে দুটো নীল রঙের জিন প্যান্ট বাড়িয়ে ধরে আবার সে বললে, "সঙ কাবোই ?"

শাঁ করে কোত্থেকে ছুটে এলেন বোসবাবু। এই মারেন কি সেই মারেন করে বাচ্চা মেয়েটাকে কী যে ছাই বলে গেলেন উনিই জানেন। মুখ চুন করে চলে গেল মেয়েটা। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল একজন আধবুড়ো লাও। ফেরিওলা নিশ্চয়। কাঁধে অনেক জিন প্যান্ট। সবই নীল রঙের। হাত তুলে দেখাল আমাদের। শিকারি বিড়ালের মতো গোঁফ নাচিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ঘুসি পাকিয়ে মেয়েটার হাত ধরে চলে গেল লোকটা।

রেগেমেগে ঘুরে দাঁড়ালাম বোসবাবুর দিকে, "ছিঃ ছিঃ! একফোঁটা মেয়ের ওপর ঝালটা না ঝাড়লেই পারতেন।"

বোসবাবু হাত-পা ছুঁড়ে বললেন, "স্পাই! স্পাই! মাকড়সা চালান করতে এসেছিল।"

"মাকড়সা! মাকড়সা দেখলেন কোথায় ?"

"আপনার চোখ থাকলে তো দেখবেন ?"

"সঙ্ কাবোই মানে কি মাকড়সা ?"

"আজ্ঞে না, সঙ্ কাবোই মানে ব্লু জিনের প্যান্ট। লাওসে তৈরি। সব লাও এখন এই প্যান্ট পরে।"

"আমিও না-হয় পরতাম।"

"তার আগেই মরতেন। পকেটে মাকড়সা পুরে সেফটিপিন দিয়ে মুখ আটকে রেখেছিল।"

"অ্যাঁ!" ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিলাম নিশ্চয়।

বোসবাবু অভয় দেওয়ার ভঙ্গিমায় বললেন, "ভয় পাবেন না, অত ঘাবড়ে যাবেন না। আমি তো আছি, আর আছেন ইন্দ্রনাথ রুদ্র।
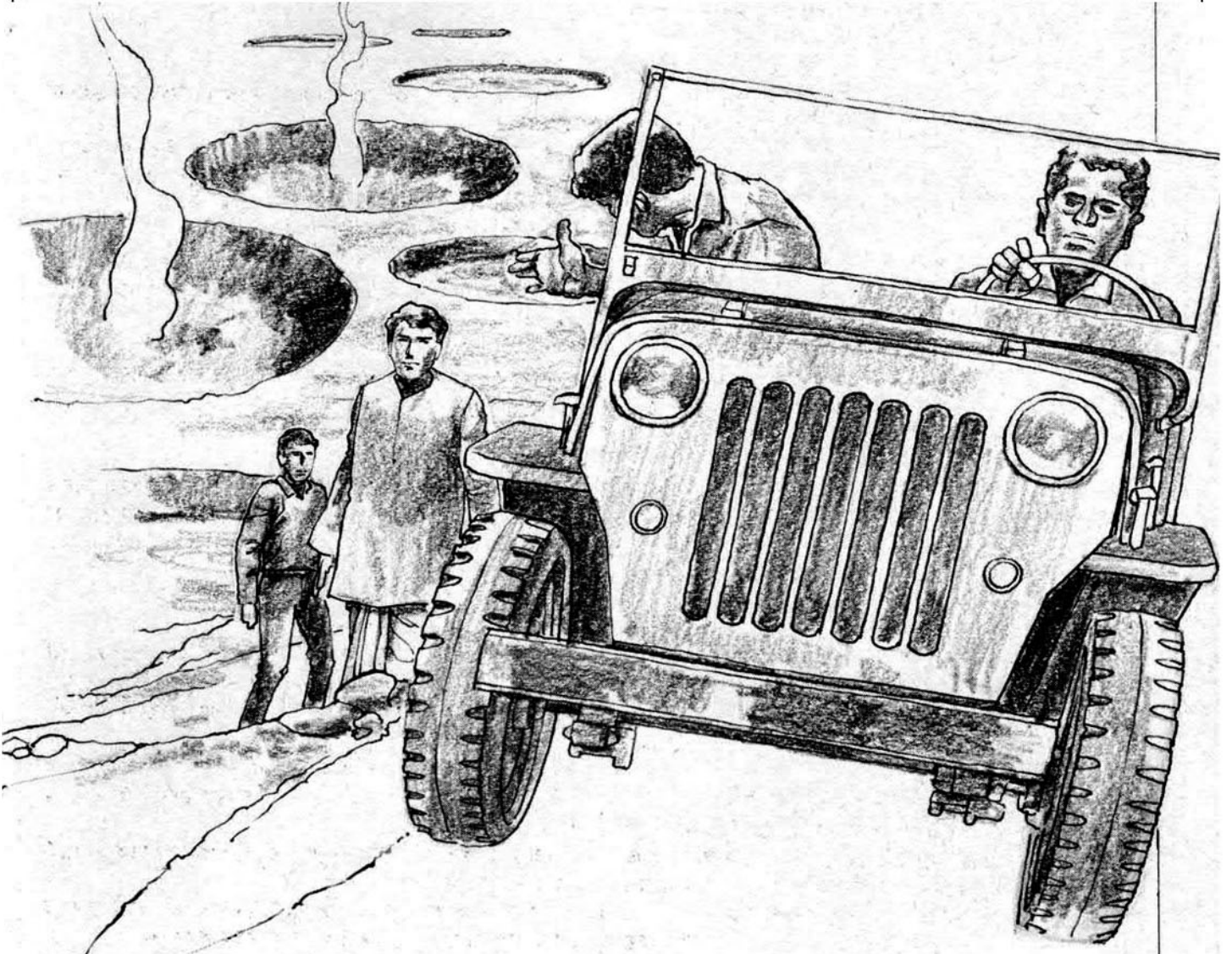
লক্ষ্যভেদী ইন্দ্রনাথ রুদ্রের গুলি কখনও ফসকায় না। হাঃ হাঃ হাঃ! মশাই, মেয়েটার পেট-কাটা দেখেই গলে গেলেন?"

ঢোক গিলে বলেছিলাম, "ওরকম বীভৎস ভাবে পেটটা কাটল কী করে?"

"বোমায়...বোমায়...আমেরিকান বোমায় একখানা চোখ গেছে, পেটও ফেটেছে। ওরকম কেস এদেশে ঢের দেখবেন। গলে যাবেন না, গুপ্তচরের বেশে এদেরকেই লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের পেছনে। পান্না-বুদ্ধর ঠিকানা যে শুধু আমিই জানি। হাঃ হাঃ হাঃ!"

মাথার মধ্যে কীরকম যেন করে উঠল সেই হাসি শুনে। ইদানীং বোসবাবু যখন-তখন এই রকম বিটকেল হাসি হেসে চলেছেন। নদীর পাড়ে জেটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অনেক মানুষই ঘুরে দাঁড়াল সেই হাসি শুনে। দূর থেকে হনহন করে হেঁটে আসতে দেখলাম ইন্দ্রনাথকে।

জঙ্গলের মধ্যে কেন গিয়েছিল ইন্দ্রনাথ? মেকং-এর দু' পাড়েই ঘন সবুজ গাছপালার জটলা বড্ড বেশি। শহুরে মানুষ আমি। আমার কাছে তা জঙ্গল বলেই মনে হয়। অনেক বড় নৌকো ভাসছে তীর ঘেঁষে। নৌকো না বলে সেগুলোকে কাঠের ভাসমান বাড়ি বলা উচিত। লাওসে ঋতু বিপর্যয়ের জন্য মানুষগুলো ডাঙার চাইতে জলে থাকাই অনেক নিরাপদ মনে করে।

ইন্দ্রনাথ বেরিয়ে এল এইরকমই একটা বড় বজরার সামনের জঙ্গল থেকে। বজরা থেকে একটা কাঠের পাটাতন নেমে এসেছে তীর পর্যন্ত। জঙ্গল শুরু হয়েছে জলের ধার থেকেই। ইন্দ্রনাথ কি ওইখানেই এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল?

বিমূঢ় চোখে চেয়ে থাকায় প্রথমটা খেয়াল করিনি। তারপর স্পষ্ট দেখলাম, গাছপালার সঙ্গে গা মিলিয়ে দাঁড়িয়ে একটা লোক। গায়ে তার মিলিটারি পোশাক। জংলা পোশাক বলেই পাতা আর ডালের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে।

রোদ্দুর ঠিকরে যাচ্ছে তার হাতের অটোমেটিক রাইফেল থেকে। অত দূর থেকেও বুঝলাম লোকটা অনিমেষে চেয়ে রয়েছে আমাদের দিকেই।

মাছপুকুরে বিস্ফোরণ

তুরুক-নাচ নেচে নিয়ে বললেন বোসবাবু "কোথায় গিয়েছিলেন?"

পেছনের জঙ্গল দেখিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, "ওখানে..."

র‍্যাম্বো-রা কিন্তু ওঁত পেতে আছে। একটু আগেই মৃগবাবু স্বর্গে চলে যেতেন।"

বলার ঢঙ শুনে গা চিড়বিড় করে উঠল আমার। বললাম, "অত ক্যাবলা ভাববেন না আমাকে। এক মাকড়সার ভয়েই তো আপনি কুপোকাত। মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করেই কাটিয়ে চলেছি বছরের পর বছর।"

অট্টহেসে বললেন বোসবাবু, "সে তো মিঃ রুদ্র আপনার সঙ্গে আছেন বলে। কিছু মনে করবেন না, সার, লেখকরা কলম আর কাগজ নিয়েই শুধু আস্ফালন করে যান। কাজে নামলে..."

বাধা দিল ইন্দ্রনাথ, "বজরায় যাবেন, না গাড়ি নেবেন?"

থমকে গিয়ে মেকং-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন বোসবাবু। একটু একটু করে ঘোলাটে হয়ে এল চোখ দুটো। হাওয়ায় উড়ছে পাতলা সিল্কের মতো রুখু চুল। মানুষটাকে এখন আর স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

একটু পরে বললেন জড়িত স্বরে, "একটু ভাবতে দিন। মনের ছবি কেন যে ছাই স্পষ্ট হচ্ছে না...।"

মেকং-এর দিকে তাকিয়ে বোসবাবু যখন ধ্যানস্থ, ইন্দ্রনাথ আমাকে টেনে নিয়ে সরে এল একটু তফাতে। বললে, "কী হয়েছিল রে?"

বললাম সঙ্ কাবোই আর পেট-কাটা মেয়েটার কথা।

সব শুনে বললে, "সঙ্ কাবোই মানে কাউবয় ট্রাউজার্স। লাও জোয়ানরা এখন এই প্যান্ট পরে। বিদেশী দেখে তোকেও পরাতে এসেছিল। বোসবাবু ধরেছেন ঠিকই। লোভে পড়ে এতক্ষণে পরলোকে চলে যেতিস।"

"তার আগে যেতে হত ওয়াট-এ," পেছন থেকে বলে উঠলেন বোসবাবু।

"সেটা আবার কোথায়?" সকৌতুকে শুধোয় ইন্দ্রনাথ।

"ওয়াট মানে মঠ। পরলোকেই যান আর ইহলোকেই থাকুন—ওয়াটে আপনাকে যেতেই হবে।"

রেগে যাচ্ছিলাম। কথা ঘুরিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ, "আপাতত যাবেন কোন চুলোয়?"

"মন ব্যাটা বড় বেগড়বাঁই করছে। চলুন, রুট থার্টিন ধরে রাজধানী ছেড়ে একটু বেরনো যাক। কখন যে ফ্ল্যাশ দেবে মনের ভেতরে তা ভগবান জানেন।"

"চলুন।"

তাই আমরা রাজধানী ভিয়েনতিয়ানে থেকে বেরিয়ে পড়েছি রুট থার্টিন সড়ক ধরে। চলেছি উত্তর দিকে। এখন শুকনো ঋতু। মাস তিনেক আগে থেমেছে বিরামবিহীন বৃষ্টি, বর্ষা আসতে আরও পাঁচ মাস।

"লাওস দেখবার উপযুক্ত সময় এটা," বিড়বিড় করে বললেন বোসবাবু।

"আপনার মনের জ্যোতির ফোয়ারা খুলে দেওয়ারও উপযুক্ত সময় বটে, টিপ্পনী কাটলাম আমি।

কুতকুতে চোখে শুধু আমার দিকে তাকিয়েই ফের অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন বোসবাবু। বেশ বুঝছি, ঝড় উঠেছে ওঁর মনের আকাশে। তাই এই অবস্থা। লোকটা একটা সচল রহস্য। যত দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি।

খোলা-জিপ হু-হু করে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। বাদামি রঙের ধানখেত। চষা মাঠ। ধান কেটে নেওয়া হয়েছে। গোড়াগুলো রোদে জ্বলে বাদামি হয়ে রয়েছে। গাড়ি মেরামতের একটা টিনের চালাও দেখলাম। ইংরেজিতে লেখা রয়েছে সাইনবোর্ডে 'সুইডেন প্রতিষ্ঠিত'। তারপরেই একটা মুরগির খামার। 'অস্ট্রেলিয়ান সরকারের উদ্যোগ' বোমায় বিধ্বস্ত লাওসকে গড়তে এগিয়ে এসেছে অনেক দেশ। শ্রীবৃদ্ধির ছাপ দু'পাশে দেখতে পাচ্ছি। কিছু বাড়ি লাও কায়দায় তৈরি হলেও থামগুলো কিন্তু আধুনিক কংক্রিটের। কাঠের নয়। খানকয়েক বাড়ি ইট দিয়েও গড়ে উঠেছে। এতক্ষণে দেখলাম একটা সবুজ ধানখেত। নতুন চারা গজাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ান উপদেশে একই বছরে দু'বার ফলনের আয়োজন। সাইনবোর্ডের লেখা থেকেই যে-কোনও ট্যুরিস্ট যাতে বুঝতে পারে, সে ব্যবস্থার ত্রুটি নেই কোথাও। খেতের জল আসছে নাম গুম বাঁধের জলাধার থেকে।

ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম জলবিদ্যুৎ বাঁধে। ট্যুরিস্ট জিপ দেখেই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন ম্যানেজার নিজেই। তড়বড় করে অনেক কথাই বলে গেলেন। এই কিছুদিন হল সুইডেন থেকে ট্রেনিং নিয়ে ফিরেছেন। পাঁচখানা জেনারেটর আর অন্যান্য সরঞ্জাম

এসেছে জাপান, পশ্চিম জার্মানি আর ইণ্ডিয়া থেকে। সুইজারল্যান্ড দিয়েছে কারিগরি দক্ষতা, বিশ্বব্যাঙ্ক টাকা।

ম্যানেজারের বক্তৃতা শুনলাম শুধু আমি আর ইন্দ্রনাথ। বোসবাবু সরে গেছেন অনেক তফাতে। বারোশো ফুট লম্বা বাঁধের মাথায় যে রাস্তা, তার ওপর দাঁড়িয়ে উনি আধবোজা চোখে চেয়ে রয়েছেন উত্তর-পুবের পাহাড়গুলোর দিকে। বিশাল সবুজ সরোবরে ছায়া ভাসছে পর্বতমালার।

ম্যানেজার হাত-পা নেড়ে বললেন, "লেকের জল কত গভীর জানেন ?"

"কত ?" আনমনা গলায় বললে ইন্দ্রনাথ। ওর চোখ বোসবাবুর দিকে।

"১৮০ ফুট। রোজ দশ টন মাছ ওঠে জল থেকে। মোট দশ রকমের মাছ। আর ওই যে তিনটে দ্বীপ দেখছেন, ওদের নাম শান্তির দ্বীপ, ছেলে দ্বীপ, মেয়ে দ্বীপ।"

"এরকম নাম কেন ?" এবারের প্রশ্ন আমার।

"স্বাধীনতার পর অশিক্ষিতদের ওই তিনটে দ্বীপে রেখে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। মেয়েদের আর ছেলেদের রাখা হয়েছিল আলাদা দ্বীপে।"

"আর ওই উঁচু পাহাড়টা ? ওর নাম কী ?"

"ফৌবিয়া, এদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। হাইট ন'হাজার দু'শো পঁয়তাল্লিশ ফুট।"

নীল আকাশের বুকে ঠিক যেন ধোঁয়ায় গড়া চুড়ো লেপটে রয়েছে। চোখ নামিয়ে দেখলাম, বোসবাবুও একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন সেদিকে।

ম্যানেজারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইন্দ্রনাথ এবার এগোল ওঁর দিকে। নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ালাম পেছনে। বোসবাবু টের পেলেন না। কান পেতে শুনলাম ফিসফিস করে উনি বলছেন, "কলসির মাঠে দৈত্যদের উনুন···পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তি···ধুস্ ! যোগে মিলছে না !"

ফেরার পথে জিপ দাঁড়াল একটা মাঠের পাশে, বোসবাবু উত্তেজিতভাবে জিপের মধ্যে সটান দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন বলেই জিপ দাঁড়িয়েছে।

লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমেই উনি দৌড়লেন মাঠের মধ্যে। পেছনে আমি আর ইন্দ্রনাথ।

উঁচু রাস্তা থেকে দেখেছিলাম, তেপান্তরের মাঠে অজস্র গর্ত। ঠিক যেন চাঁদের বুকে উল্কাপাতের গহ্বর। কাছে গিয়ে দেখলাম, প্রতিটা গোল গর্তে জল ভর্তি, তাতে ঘাই মারছে অজস্র মাছ।

মাছের পুকুর প্রত্যেকটা গর্ত।

লাফাতে লাফাতে বললেন, "দেখলেন। দেখলেন। আমেরিকান বোমার কাণ্ড দেখলেন।"

হতভম্ব গলায় বললাম, "কী বলছেন, খুলে বলুন।"

"আর কত খুলে বলব মশাই ? আকাশ থেকে টপাটপ বোমা ফেলে গর্ত বানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বোমারুরা। এখন তাতে হচ্ছে মাছের চাষ। একজন চাষি দুঃখ করেছিল মাছের পুকুর নেই বলে। সেই রাতেই পড়ল বোমা। চাষি পেল পুকুর।"

"আপনি পেলেন কী ?" আচমকা পাশ থেকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয় ইন্দ্রনাথ।

"আ···আমি ! আমি আবার কী পাব ?" হকচকিয়ে গেলেন বোসবাবু।

"বোমায় কারও পেট ফেটেছে, কারও চোখ গেছে, কারও বাবা-মা সর্বস্ব গেছে, আবার কেউ পেয়েছে মাছের পুকুর, কেউ হয়েছে ফকির, কেউ হয়েছে উজির। বোমায় লণ্ডভণ্ড লাওস-এর মাটি ফেটে পুকুর গজায়, পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তিরা কেন উঠে আসে না ?"

কথাটা ঠাট্টা করেই বলেছিল বোধ হয় ইন্দ্রনাথ। ওর চোখ-মুখের হাসি তার প্রমাণ। কিন্তু বোসবাবুর মুখটা শুকিয়ে কালো হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে।

আর ঠিক তখনই প্রচণ্ড শব্দে বাঁ দিকে একটা মাছের পুকুর ফেটে উড়ে গেল আকাশের দিকে। কানে তালা লেগে গেল ভয়াবহ বিস্ফোরণের আওয়াজে। ধুলো আর জল আকাশে ছিটকে গিয়ে নেমে এল আমাদের সারা গায়ে।

ধোঁয়া কেটে গেলে বোসবাবুকে আমাদের পাশে দেখতে পেলাম না।

মেকং নদীর সোনার চড়া

বারুদের ধোঁয়ায় কাসতে-কাসতে বললাম, "গেলেন কোথায় বোসবাবু ?"

নির্বিকারভাবে আশপাশে তাকাতে-তাকাতে ইন্দ্রনাথ বললে, "ড্রাইভার আগেই বলেছিল, এ-মাঠে বোমার গর্তে এখনও অনেক বোমা পড়ে আছে। আকাশ থেকে পড়েও ফাটেনি।"

"তুই জানতিস ?"

"জেনেশুনেই তো এসেছি," ইন্দ্রনাথের গলার সুরে এবার হেঁয়ালি ফুটে ওঠে, "বোসবাবু নিজে হুজ্জুতি করে নেমে না পড়লে আমিই নামতাম।"

"বোমায় উড়ে যাওয়ার জন্য ?"

"মৃগ, বারো বছর ধরে, যে বোমাগুলো এদেশের নানান জায়গায় পড়ে রয়েছে, খুব জোরে ঘা না মারলে যারা ফেটে যায় না, আচমকা আজ তারা কেন ফেটে উড়ে গেল বল তো ?"

"জবাবটা তুই জানিস মনে হচ্ছে ?"

"আমি ? হয়তো জানি। কিন্তু এখন বলব না। সময় এলে অনেক কিছুই জানতে পারবি, মৃগাঙ্ক। তোর গল্পের ভাঁড়ারে এমন গল্প এর আগে আর জমা পড়েনি। যথাসময়ে বুঝবি, চল, খোঁজা যাক বোসবাবুকে।"

"কোথায় তিনি ?"

"যেখানে বোমা থাকার আশঙ্কা নেই, সেখানে।"

বলে আমার কাঁধ ধরে পেছন দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে আঙুল তুলে দেখাল ইন্দ্রনাথ। দেখলাম, দূরে উঁচু রুট থার্টিন সড়কের জিপে উঠে বসে আছেন আমাদের রহস্যময় সঙ্গী মাইকেল পল ওরফে বোসবাবু।

কাছে যেতেই দাঁত বের করে হাসলেন ভদ্রলোক। হলুদ দাঁত। উনি যে কখনও দাঁত মাজেন না, সেটা একসঙ্গে বেরিয়ে ইস্তক লক্ষ করছি।

বললেন, "খুব জোর বেঁচে গেছি। ভাগ্যিস একদম সামনের গর্তে এক্সক্লোশনটা ঘটেনি।"

"ঘটলেও আপনার কিছু হত না," ইন্দ্রনাথ ওর সেই বিখ্যাত ভুবনভোলানো হাসি হেসে বললে, "রাখে কেষ্ট, মারে কে। কেষ্ট এখন আপনাকে দিয়ে পান্না-বুদ্ধ খোঁজাচ্ছেন। তাঁর কাণ্ডজ্ঞান আছে।"

হাঃহাঃ করে আবার বিচ্ছিরি হাসি হেসে বোসবাবু বলে উঠলেন, "আপনার কেষ্টকে বলুন আমার ব্রেনে পান্না-বুদ্ধদেব ঠিকানার ছবিটা কেবল ভাসিয়ে দিতে। ব্রেন যে ফাংশন করছে না একেবারেই।"

“এরকম শক্ পেয়েও করছে না ? ” বোসবাবুর চোখে-চোখে তাকিয়ে আস্তে-আস্তে বললে ইন্দ্রনাথ।

সে চোখের চাহনি বড় অসাধারণ। দূরবিনের মতো যেন মনের ভেতর পর্যন্ত দেখতে চায়। ইন্দ্রনাথ যখন এভাবে কারও দিকে তাকায়, তখন তার অবস্থা কাহিল না হয়ে যায় না।

বোসবাবু কিন্তু অটল রইলেন। ইন্দ্রনাথের চোখে চোখ রেখেই বললেন, “শক্ ? কিসের শক্ ?” গলার স্বর ঠাণ্ডা।

“এই যে আচমকা আওয়াজ, ধোঁয়া, চারদিক কেঁপে ওঠা…”

“ধুস ! ওতে আমার কিছু হয় না। চলুন, চলুন, ফেরার পথে ‘কিলোমিটার সিক্স’ দেখে যাই। যদি ব্রেন খোলে।”

আর কোনও কথা না বলে আমাকে টেনে নিয়ে জিপে উঠে বসল ইন্দ্রনাথ। সেই সময়ে দেখলাম, মিলিটারি ইউনিফর্ম পরা একদল লোক যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসে হনহন করে যাচ্ছে বোমা যে গর্তে ফেটেছে—সেইদিকে।

বোসবাবুও তা দেখে নিয়ে তাড়া লাগালেন ড্রাইভারকে, “কুইক। কুইক !”

কিলোমিটার সিক্স একটা উপনগরী। ভিয়েনতিয়ানে শহরের বাইরে। আমেরিকানরা একসময়ে এখানে ঘাঁটি গেড়েছিল, ইন্দ্রপুরী গড়ে তুলেছিল। এখন সেখানে লাও পিপলস রিভলিউশনারি পার্টির সদর আড্ডা। কড়া পাহারা দিয়ে চলেছে রাইফেলধারী শান্ত্রীরা।

দূর থেকে দেখেই চুপসে গেলেন বোসবাবু, "যাচ্চলে ! এখানেও মিলিটারি !"

হাসি চেপে ইন্দ্রনাথ বললে, "ওরা তো দুশ্‌মনের যম। আপনার নয়।"

"ওদের দেখলেই আমার ব্রেন ফাঁকা হয়ে যায়। চলুন, চলুন।"

"এবার কোথায় ?"

"আগের রাজাদের রাজধানীতে।"

তাই এবার উড়ে যাচ্ছি আকাশ-পথে। বিশাল এই প্যাসেঞ্জার প্লেন তৈরি হয়েছে সোভিয়েত দেশে, উড়ছে লাওসের আকাশে। ভিয়েনতিয়ানে ছাড়িয়ে উত্তর দিকে যেতে-যেতে পায়ের তলায় পেরিয়ে এলাম অরণ্যসবুজ পাহাড়-পর্বত। ঠিক যেন সবুজ কার্পেট দিয়ে মোড়া উঁচু-নিচু পাহাড়গুলো। পায়ে খোঁচা লাগবে না যদি বিশাল পা নিয়ে হেঁটে যায় এর ওপর দিয়ে। ওপর থেকে দেখে মনে হচ্ছে, মানুষজন থাকে না নির্জন এই প্রকৃতির দেশে। কিন্তু সে ভুল ভেঙে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। সবুজ আস্তরণ ফুঁড়ে উঠে আসছে নীলচে ধোঁয়া। আগুন জ্বালাচ্ছে লাও থিয়াঙ্ আর লাও সাউঙ্ উপজাতিরা। পাহাড়েই এদের বাস। পাহাড়ি অঞ্চলের জঙ্গল পুড়িয়ে ধানজমি বের করছে চাষ আবাদ করবে বলে। তিরিশ মিনিট পরে এসে গেল মেকং আর জেঙ নদীর সঙ্গম। বেশ কয়েকটা লাল আর সোনালি মঠ রোদ্দুরে ঝকমক করছে। বড় শান্তির দেশ এই লুআঙ্ প্রাবাঙ্। এখানে হাওয়া-গাড়ি নেই বললেই চলে। আকাশ-পথ থেকে দেখা যাচ্ছে শুধু বৌদ্ধমঠ, সোনা আর মরকত দিয়েই তৈরি মনে হচ্ছে অত উঁচু থেকে।

কানের কাছে বোসবাবু ধারাবিবরণী দিয়ে যাচ্ছিলেন অনেকক্ষণ ধরেই। অপূর্ব সুন্দর মঠগুলোর দিকে আঙুল নামিয়ে বললেন, "ওই দেখুন, ওয়াট জিয়েঙ্ থঙ্। ওদিকে ওয়াট আফে, আর এই এদিকে তাকান, ওয়াট ভিক্সান।"

ভদ্রলোক অনেক খবর রাখেন। ওঁর এই বিরক্তিকর অট্টহাসিটা সহ্য করতে পারি না ঠিকই, কিন্তু পাক্কা গাইডের মতো যখন কথা বলে যান, তখন মুগ্ধ হয়ে শুনে যেতে হয়। লাওস যেন ওঁর নখদর্পণে।

প্লেন থেকে নেমেও সেই প্রমাণ দিয়ে গেলেন বারবার। ভিয়েনতিয়ানে থেকে বেরোবার আগে উনিই বলেছিলেন, আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করলে রয়্যাল প্যালেসে ঢোকা যাবে না। ইন্দ্রনাথ তক্ষুনি ফরেন মিনিস্ট্রিতে যোগাযোগ-তারবার্তা পাঠিয়ে দিয়েছিল লুআঙ্ প্রাবাঙে। তাই সহজেই ঢুকতে পারলাম সেখানে। বাইরে থেকে প্রসাদটা কাঠখোট্টা চেহারার হলে কী হবে, রিসেপশন-রুমে পা দিয়েই বুঝলাম রাজাদের জায়গায় এসেছি বটে। সোনা আর ব্রোকেডের ঝলমলানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যায় আর কি। ঘুরে-ঘুরে দেখলাম গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পাঠানো উপহারগুলো। মাও পাঠিয়েছেন একটা চায়ের কাপ, লিনডন জনসন দিয়েছেন মেডেল, শটগান পাঠিয়েছেন ব্রেজনেভ।

গুলি-গুলি চোখ করে বোসবাবু সবকিছুই দেখে যাচ্ছেন। ইন্দ্রনাথ রয়েছে ঠিক ওঁর পেছনে। ব্রেন যে কখন খুলবে, কখন বায়োস্কোপের মতন পান্না-বুদ্ধদের ছবি ভাসবে মনের পরদায়, সেই আশায় এরকম ঘোড়দৌড় জীবনে করিনি। ইন্দ্রনাথ আমার মতো কল্পনার ফানুস নয়। ও যে কেন হুট করে বোসবাবুর কথায় সায় দিয়ে মরীচিকার পেছনে দৌড়ে এল, তাও বুঝছি না। দু'চক্ষে দেখতে পারি না ওর এই বিচ্ছিরি অভ্যেসটা, মাঝে-মাঝেই মনের সিন্দুকে ইয়াব্বড় তালা ঝুলিয়ে রাখে!

প্যালেস ঢুঁড়ে গেলাম মার্কেটে। পাহাড়ে চাষকরা আফিং বিক্রি করছিল পাগড়ি-পরা হোমোং মেয়েরা। পাহাড়ের বাড়ি থেকে এই বাজার তাদের কাছে মাত্র একদিনের পথ।

বোসবাবু আফিং-এর গুলিগুলোর দিকে গুলি-গুলি চোখে তাকিয়ে রয়েছেন দেখে বলেই ফেললাম, "চলবে নাকি ? মৌতাতে পান্না-বুদ্ধদের ছবি এসে যেতে পারে মগজে।"

"ধুস !" বলে বেগে বাজার থেকে প্রস্থান করলেন বোসবাবু। পেছনে আমরা দুই বন্ধু।

পরের দিন ঠাণ্ডা ভোরে উঠে বসলাম নৌকোয়। মেকং নদীর চেহারা এখানে খুবই শীর্ণ। যেন খাদের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। দু'পাশের পাড় খাড়াভাবে উঠে গেছে। উর্বর জমিতে চাষ আবাদ চলছে। মেয়েরা বালতি করে জল নিয়ে যাচ্ছে চাষের মাঠে ঢালবে বলে। গাছগাছড়া নদীর জল থেকেই গজিয়েছে অনেক জায়গায়। কুমড়োর মতন একরকম ঢাউস সবজি শুকোতে দেওয়া হয়েছে পাড় বরাবর।

আঙুল তুলে বললেন বোসবাবু, "ফাক নাম।"

"সেটা আবার কী ?" তন্ময় হয়ে চেয়ে ছিলাম বলে চমকে উঠেছি হঠাৎ বিদঘুটে শব্দ দুটো শুনে।

"ওই সবজিটার নাম। তোফা খেতে মশাই। ওর সঙ্গে বাঁশের টক-ঝোল, আর শুওরের ছক্কা।"

"আপনি খেয়েছেন মনে হচ্ছে ?"

"আপনিও চেটেপুটে মেরেছেন। এখান থেকেই সাপ্লাই যায় ভিয়েনতিয়ানে।"

জানি না হোটেলের কোন্ খানায় খেয়েছি ফাক নাম, শুওরের ছক্কা আর বাঁশের ঝোল, এখন কিন্তু গা পাক দিয়ে উঠল কথাটা শুনেই।

আচমকা ফের কানের কাছে চেঁচিয়ে উঠলেন বোসবাবু, "লৌ লাও।"

"আবার কী হল ?"

"পানীয় মশাই, পানীয়। লাওদের অতি প্রিয় পানীয়। ওই দেখুন ভাত থেকে বানাচ্ছে।"

বাঁ দিকের তীরে খানছয়েক খড়ে ছাওয়া কুঁড়েঘরের দিকে আঙুল তুলে পানীয়খানাগুলো দেখাতে গিয়েই আচমকা উজান স্রোতের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন হয়ে গেলেন বোসবাবু। অস্ফুট স্বরে বললেন শুধু একটাই শব্দ, "সোনা !"

চকিতে মুখ ফেরাল ইন্দ্রনাথ। আমরা তিনজনেই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি নৌকোর ছাদে। উজানে চলেছে নৌকো। কোথায় চলেছে তা জানতে চাইনি। বোসবাবু বলেননি। বললেন এখন।

"সোনা ! সোনা ! মেকং নদীর সোনা !"

কিন্তু কোথায় সোনা ? নদীর ঘোলাটে জলে শুধু দেখছি কালচে রঙের কাদাগোলা কিছু বালি বিভিন্ন রেখায় মিলেমিশে চলেছে। এর নাম কি সোনা ?

বোসবাবুর বিড়াল-চোখ কিন্তু জ্বলছে বললেই চলে। কণ্ঠে জেগেছে তীব্রতা, "ওই তো ! ওই তো ! সোনায় ভরা চড়া উঠে এসেছে জলের ওপর !"

অদূরে দেখলাম সেই দৃশ্য। নৌকো প্রতিকূল স্রোত ঠেলে এগোচ্ছে সেই দিকেই।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি : বিমল দাস

পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তি

অদ্রীশ বর্ধন
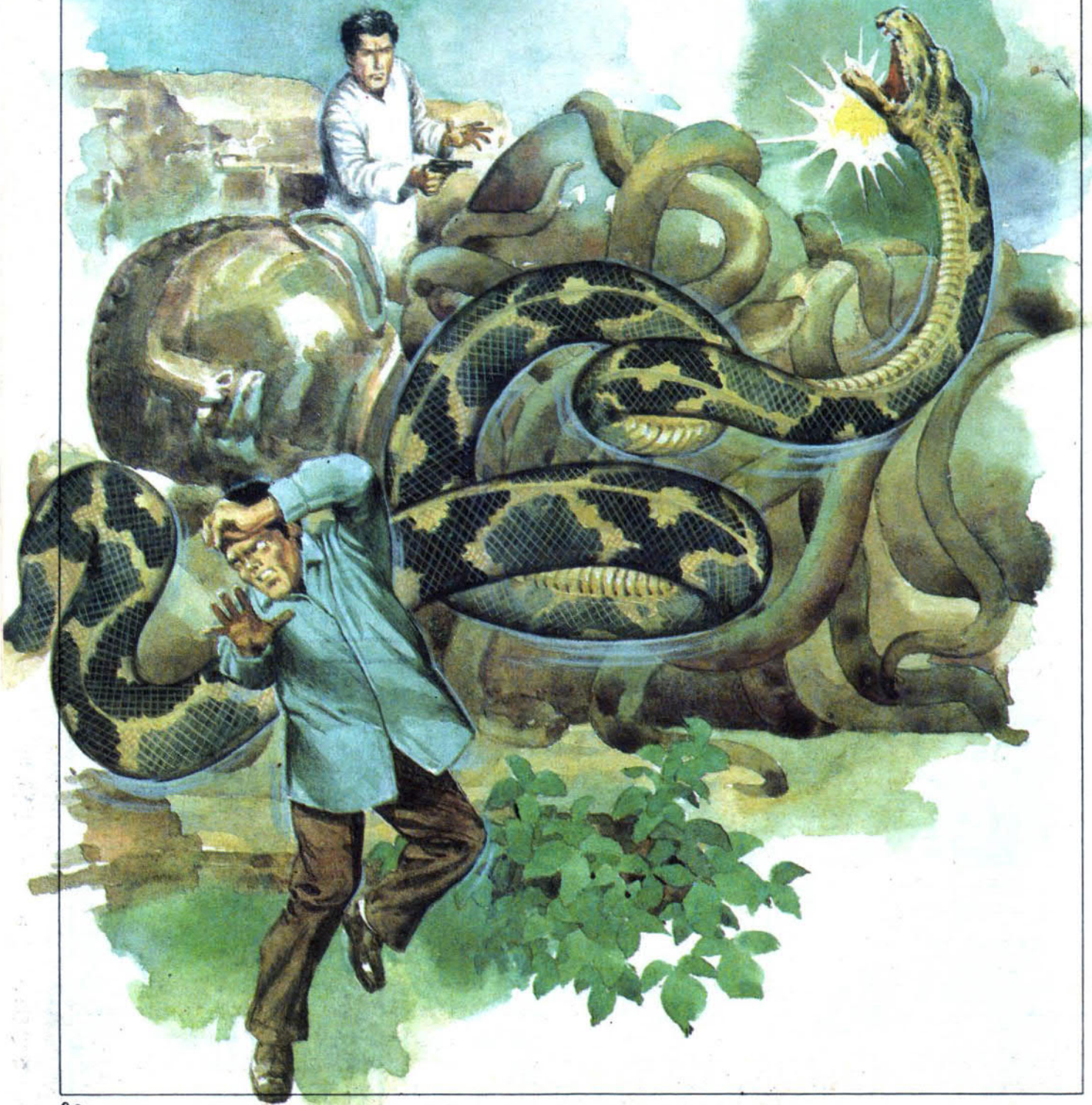
মেকং নদীর একদিকে শ্যামদেশ, আর একদিকে লাওস। পশ্চিম দিকে এসে এই নদীই আবার সোজা উত্তরমুখো হয়ে লাওসের ঠিক মাঝখান দিয়ে গেছে। নদী এখানে অনেক সরু। পাহাড় থেকে আও আর জেঙ নদী নেমে এসে এক হয়ে গিয়ে যেখান থেকে মেকং শুরু হয়েছে, সোনার চর জেগে উঠেছে ঠিক সেইখানে।

জায়গাটা অপরূপ। একদিকে চুনাপাথরের পাহাড়, নদীর পাড় থেকে খাড়াইভাবে উঠে গেছে হাজার ফুট উঁচুতে। বহুদিন আগে একটা চৈনিক তৈলচিত্রে এইরকম চোখ জুড়নো অপূর্ব দৃশ্য দেখেছিলাম। সাদা পাথরের গা থেকে রোদ্দুর ঠিকরে যাচ্ছে হাজার হাজার কিরণরেখায়। ডাইনে আর বাঁয়ে সবুজ টিলার পর টিলা।

ঠিক নীচেই জেগে উঠেছে একটা চড়া। হলুদ কাঁকর, কালচে বালি আর এদিকে-ওদিকে অজস্র কাঁটাঝোপ ছাড়া সেখানে কিচ্ছু নেই। অনেক বেতের চুপড়ি উপুড় করে ছড়ানো ছোট্ট চড়াটার নানান দিকে.। জলের ধারে খানকয়েক বেতের বাস্কেট। তার পাশে একটা উপুড় করা লোহার কড়াই।

নৌকোর ছাদে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি আরও দূরের সবুজ আর ধূসর পাহাড় আর পাহাড়। নদীর দুই পাড়েই। ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে রয়েছে দূর দিগন্তে।

কিন্তু সোনা এখানে কোথায়? চিলের মতো বোসবাবু চেঁচিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই, এক কণা সোনাও তো কোত্থাও দেখছি না। কাঁকর, বালি আর কাঁটাঝোপের মধ্যে অত দামি পাথর লুকিয়ে রয়েছে সবার চোখ এড়িয়ে— এটাও তো বিশ্বাস করতে পারছি না।

দুটি মাত্র প্রাণী নদীর জলে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে আমাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বোসবাবুর বিকট চিৎকারে চমকে উঠে তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

একজন একটি মেয়ে। লাও মেয়ে। মাথায় খোঁপা। পরনে সায়া-শেমিজের মতো পোশাক। হাতে একটা বেতের চুপড়ি। নুড়ি আর বালি তুলে জল ছেঁকে বের করছে। বদখত চিৎকার শুনে ভীষণ চমকে উঠে তাকিয়ে রয়েছে চোখ বড়-বড় করে।

তার পাশের লাও পুরুষটিও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। লাফ দিয়ে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে পড়ছে। সে যে কত গরিব, তার প্রমাণ তার পরনের শতচ্ছিন্ন হাফপ্যান্টখানা ছিঁড়ে গিয়ে সুতো ঝুলছে হাঁটু পর্যন্ত। গায়ের জ্যাকেটটা ময়লায় কয়লার মতো কালো হয়ে গেছে। মাথায় গোল উলের টুপি। হাতে এক চুপড়ি বালি আর কাঁকর। জল ছেঁকে বের করে দিচ্ছিল এতক্ষণ। আঁতকে উঠেছে বোসবাবুর বাজখাঁই চিৎকারে।

"সোনা! সোনা! সোনা!" তখনও লাফাচ্ছেন আর চেঁচাচ্ছেন বোসবাবু।

মৃদু ধমকের সুরে ইন্দ্রনাথ বললে, "আঃ! কান যে ঝালাপালা হয়ে গেল! পান্না-বুদ্ধ খুঁজতে এসে সোনার জন্য হেঁকে মরছেন কেন?"

জ্বলজ্বলে বেড়াল-চোখে তাকিয়ে বললেন বোসবাবু, "কে জানে, এখানেই পান্না-বুদ্ধদের লুকিয়ে রাখা হয়েছে কি না। শুকনো ঋতুতেই তো কেবল ভেসে ওঠে চড়াটা, ডুবে থাকে অন্য ক'টা মাস।"

"এখানে!" ভুরু কুঁচকে যায় ইন্দ্রনাথের।

"অনেক ভেবেই আপনাদের এখানে এনেছি, মিঃ রুদ্র। মরবার সময়ে মা বলেছিল কলসির মাঠে দৈত্যদের উনুন। মনে আছে?"

"আছে..."

"সেরকম উনুন এখানেও তো থাকতে পারে! বলতে গেলে বারোমাসই জলে ডুবে থাকে, তার মধ্যেই হয়তো আছে..."

"পান্না-বুদ্ধ!"

"রাইট! রাইট!"

"কিন্তু এটা তো মাঠ নয়। পাহাড় রয়েছে আশেপাশে।"

"কী মুশকিল! চড়াটাকেই মাঠ বলে ধরে নিন না।"

"ধরে নেব?" সকৌতুকে বললে ইন্দ্রনাথ।

"আলবত ধরবেন। যদিও আমার মনের পটে স্পষ্ট ছবি এখনও ভাসছে না, তবে চড়ায় নেমে একটা চক্কর মারলেই হয়তো ভেসে উঠবে, ঠিক পিটার হারকোসের ক্ষেত্রে যা ঘটত।"

"পিটার হারকোস!" এতক্ষণে মুখে কথা ফুটল আমার, "নামটা যেন শুনেছি মনে হচ্ছে?"

"শুনবেনই তো। আপনি হলেন গিয়ে লেখক মানুষ, জ্ঞানী মানুষ। পিটার হারকোস মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে বলে দিত পায়ের তলায় কোথায় আছে সোনার খনি, কোথায় আছে পেট্রল।"

"অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতির খেলা," বিড়বিড় করে বলেছিলাম আমি।

"সে-খেলা আমিও দেখাই, সার, তবে পিটার হারকোসের মতো অত জোরালো সাইকিক আমি নই। এই,কী করছিস তোরা?" শেষ প্রশ্নটা ঝোঁকের মাথায় খাস্ বাংলাতেই ছুঁড়ে দিয়েছিলেন বোসবাবু হতভম্ব লাও মেয়ে আর পুরুষটার দিকে। পরক্ষণেই লাও ভাষায় তড়বড় করে মাথা নেড়ে হাত-পা ছুঁড়ে অনেক কথা বলে গেলেন।

মিনমিন করে ওরা জবাব দিয়ে গুটিগুটি সরে পড়বার তালে ছিল। কিন্তু দাবড়ানি দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন বোসবাবু। তারপর বিকট এক হাসি হেসে হলুদ দাঁতের নোংরা দেখিয়ে বললেন আমাদের, "দেখবেন? কাদা আর বালি থেকে সোনা তৈরি হয় কী করে, দেখবেন? দেখুন, দেখুন, আমি ততক্ষণে এক চক্কর মেরে আসি চড়ায়, পিটার হারকোস, হে পিটার হারকোস, একটু দয়া করো, বাবা!"

নৌকো ঠেকেছে চড়ায়। পাটাতন নামিয়ে দিতেই আগে লাফাতে লাফাতে নেমে পড়ে পাঁইপাঁই করে ছুটে গিয়ে কাঁটাঝোপের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন বোসবাবু।

মাথার ওপর দিয়ে কলরব করে উড়ে গেল অনেক পাখি। তারপর শুধু জলের ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম আমি আর ইন্দ্রনাথ।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না কাঠের পুতুলের মতো। হেসে-হেসে হাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকছে লাও মেয়ে আর পুরুষটা। বড় নির্মল, বড় সরল হাসি। গায়ে ময়লা আছে, কিন্তু মনে ময়লা নেই।

নেমে গেলাম তীরে। ওরা সোনা তৈরি করল আমাদের সামনেই। চুপড়ি দিয়ে জল ছেঁকে বের করে নেওয়া বালি আর কাদা নিয়ে ঢেলে দিল লোহার কড়ায়। একটা বোতল থেকে চকচকে ভারী একটা তরল পদার্থ ঢেলে দিল তার ওপর।

"পারা," মৃদুস্বরে বললে ইন্দ্রনাথ।

হ্যাঁ, পারা-ই বটে। বালি আর কাদার মধ্যে সোনার গায়ে লেগে গিয়ে গুটলি-গুটলি বল হয়ে গেল। শুকনো কাঁটাগাছ জড়ো করে আগুন ধরিয়ে তাতে কড়া চাপিয়ে দিল ওরা। তারপর একটা ব্লোপাইপ দিয়ে জোরে ফুঁ দিতেই গরম পারা উবে গিয়ে রেখে গেল সোনার ছোট-ছোট গুলি। সাইজে কড়ে আঙুলের নখের সমান। তেলতেলে মসৃণ নয়, অজস্র সোনার কণা যেন চেপে গুলি পাকানো।

হাসিমুখে ওরা আমাদের দিকে তাকিয়ে একমুঠো সোনার গুলি তুলে দিলে ইন্দ্রনাথের হাতে।

না নিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে ইঙ্গিতে কী যেন বলতে যাচ্ছে ইন্দ্র, এমন সময়ে চড়ার ভেতর দিক থেকে ভেসে এল উৎকট আর্তনাদ, "মেরে

ফেললে। মেরে ফেললে! ওঃ! ওঃ! ওঃ!"

বোসবাবুর চিৎকার!

পান্না-বুদ্ধ! পান্না-বুদ্ধ!

কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিটার দিকে চেয়ে থেকে ইন্দ্রনাথ বললে, "মৃগাঙ্ক, গোটা দুনিয়ায় মাকড়সা কতরকম জাতের আছে?"

"প্রায় চল্লিশ হাজার। কিন্তু এখন..."

"এদের বিষে মানুষ কি মারা যায়?"

"কখনওই না। তবে কামড়ের জায়গার কোষগুলো বিষিয়ে গিয়ে রক্তকে বিষিয়ে দিতে পারে। ইন্দ্র..."

"তা হলে বোসবাবুর মরণ নেই। কিন্তু ভোগান্তি আছে," এই বলে নির্বিকারভাবে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। ওর চোখের সামনে উদ্দাম নাচ নেচে চলেছেন বোসবাবু। তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছেয়ে গেছে কালো কুচকুচে মাকড়সায়। সাইজে এক-একটা কালো ডুমুরের মতন।

পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছেন ভদ্রলোক। চেঁচানি শুনে লাও মেয়ে আর পুরুষটা চুপড়ি-টুপড়ি ফেলেই দৌড়ে এসেছে আমাদের সঙ্গে। ওরাও বোসবাবুর নৃত্য উপভোগ করছে। মিটিমিটি হাসছে।

"বাঁচান! বাঁচান! খেয়ে ফেললে!"

নস্যির ডিবে বের করল ইন্দ্রনাথ। একটিপ নস্যি নিতে-নিতে তৃপ্ত স্বরে বললে, "দূর মশাই, আপনি কি, ও তো মাকড়সা।"

"মা...মা...মানে? ওঃ! ওঃ! ওঃ!"

"তা আপনার গায়ে উঠল কেন?"

"পান্না-বুদ্ধ! পান্না-বুদ্ধ!"

এইবার ইন্দ্রনাথের চোখে ঝিলিক দেখা গেল। লাও মেয়ে-পুরুষটার দিকে তাকিয়ে শ্রেফ বাংলায় এক ধমক মেরে বলে উঠল, "হাঁ করে দেখছিস কী? আগুন জ্বালা!" বলে, নিজেই শুকনো কাঁটাগাছ উপড়ে এনে ফস করে দেশলাই জ্বেলে তাতে আগুন লাগিয়ে আগুন-ধরা কাঁটাগাছ দুলিয়ে গেল বোসবাবুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

টুপটুপ করে খসে পড়ল গুটলি-গুটলি কালো মাকড়সাবাহিনী। পোকা নয় বলেই আটঠেঙে এই প্রাণীদের বুদ্ধি নিশ্চয় আছে। তাই 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' নীতি অনুসরণ করে চোঁচা দৌড় মারল মাটির একটা গর্তের দিকে। দেখতে-দেখতে যেন একটা কালো কালির স্রোত নেমে গেল গর্তের ভেতরে। নিঃশব্দে, অবিশ্বাস্য বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল গা-ঘিনঘিনে অষ্টপদ ভয়ঙ্কররা।

বোসবাবু ধড়াস করে পড়ে গেলেন মাটিতে। চোখ কপালে তুলে গোঁ-গোঁ করে উঠলেন, "জল! জল!" প্রথমে বললেন বাংলায়, তারপর লাও ভাষায়। নিশ্চয় জলই চেয়েছিলেন, তাই লাও মেয়ে আর পুরুষটা নক্ষত্রবেগে দৌড়ল জল আনতে।

চোখের আড়ালে ওরা যেতে-না-যেতেই তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন বোসবাবু। চক্রান্তকারীর মতো গলার স্বর খাদে নামিয়ে এনে বললেন ফিসফিস করে, "পান্না-বুদ্ধ! পান্না-বুদ্ধ!"

"কোথায়?" ইন্দ্রনাথের প্রশ্ন একটাই।

"মাকড়সাদের গর্তে!"

"আপনি দেখেছেন?"

"ছবি দেখেছি, মাথার মধ্যে। হাত ঢোকাতেই ব্যাটারা পিলপিল করে বেরিয়ে এসে..."

থেমে গেলেন বোসবাবু। জল নিয়ে দৌড়ে আসছে লাও মেয়ে আর ছেলেটা। কাছে আসতেই ওদের হাত থেকে মাটির কুঁজোটা কেড়ে নিয়ে ঢকঢক করে জল খেলেন বোসবাবু। কুঁজো বাড়িয়ে দিলেন আমাদের দিকে, "খাবেন?"

নীরস স্বরে বললে ইন্দ্রনাথ, "না।"

কুঁজো ফিরিয়ে দিয়ে লাও ভাষায় তেরিমেরি করে বোসবাবু যা বললেন, নিশ্চয় তার বাংলা মানেটা এই, "যা পালা!"

তা পালিয়েই গেল ওরা।

আমরা এখন মাকড়সার গর্ত ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি। তিনজনের হাতেই শুকনো কাঁটাগাছের আঁটি। ইন্দ্রনাথের হাতে দেশলাই।

কাঠি জ্বলল। একে-একে জ্বলে উঠল তিনটে আঁটি। ইন্দ্রনাথ বললে, "এক, দুই, তিন।" তিন বলার সঙ্গে-সঙ্গে তিনজনেই মশাল তিনটে গর্তের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে তিনলাফে সরে এলাম অনেকটা দূরে।

গর্তের মুখটা বেশ বড়। একটা মানুষ গলে যেতে পারে অনায়াসে। ভেতরে কাদামাটি, বালি, কাঁকর, কিচ্ছু নেই। কত গভীর, তা জানতে হলে গর্তের কিনারায় যেতে হবে বলে সে চেষ্টাও কেউ করিনি। তবে বেশ গভীর নিঃসন্দেহে। তিন-তিনটে মশালের ঝপ করে আছড়ে পড়ার শব্দটা শুনলাম সেকেন্ড কয়েক পরে। তারপরেই গলগল করে ধোঁয়া বেরিয়ে এল গর্ত দিয়ে। সেই সঙ্গে পিলপিল করে কালো মাকড়সাদের স্রোত।

আরও খানিকটা দূরে সরে গেলাম। দূর থেকেই যখন দেখলাম আর একটাও মাকড়সা বেরোচ্ছে না গর্ত থেকে, প্রথমেই লাফ মেরে এগিয়ে গেলেন বোসবাবু। ওঁর ট্যাঁকে যে একটা সরু টর্চ গোঁজা ছিল, তা জানতাম না। গর্তের কিনারায় হুমড়ি খেয়ে পড়েই টর্চ মেরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই যাঃ!"

ততক্ষণে আমরা পৌঁছে গেছি কিনারায়। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে দেখছি গর্তের তলদেশ। সেখানে রয়েছে একটা মাটির জালা।

শূন্য জালা। ভেতরে কিছু ছিল, এখন নেই। কিছু অগ্নিদগ্ধ মাকড়সা আট পা গুটিয়ে উলটে পড়ে রয়েছে তলায়।

বজরায় উঠে মুখখানা উৎকট গম্ভীর করে বসে রইলেন বোসবাবু। কথা বলতে গেলেই খ্যাঁক করে উঠছেন দেখে ইন্দ্রনাথকে নিয়ে আমি সরে এলাম অন্যদিকে। বললাম চাপা গলায়, "খটকা লাগছে একটা ব্যাপারে।"

"যথা?" ইন্দ্রনাথের চোখে নাচছে হাসি।

"চড়াটা জলের তলায় ছিল অ্যাদ্দিন?"

"ছিল।"

"জল থেকে উঠেছে এই কিছুদিন?"

"উঠেছে।"

"গর্তের মধ্যে কাদামাটি, বালি, কাঁকর থাকা উচিত ছিল না কি?"

"উচিত ছিল।"

"কিন্তু তা নেই কেন?"

"কেউ এসে চেটেপুটে রেখেছে বলে।"

"সে কে?"

"চুপ করে যা, মৃগ। আর বকিসনি!"

চুপ করেই গেলাম। শুধু বুঝলাম, বোসবাবু জবরদস্ত সাইকিক। খুঁজে-খুঁজে ঠিক জায়গাতেই এসেছিলেন। গর্তের জালায় নিশ্চয় কিছু ছিল, তার দামও অনেক। তাই আমাদের আগেভাগে কোনও মূর্তিমান এসে মাকড়সাদের তাড়িয়ে মাটি খুঁড়ে জালা সাফ করে রেখে গেছে।

সে কে?

কলসি-মাঠের গুপ্তধন

রোখ চেপেছে বোসবাবুর। চাহনিও যেন কীরকম-কীরকম। চোখের মধ্যে থেকে যেন আর-এক চোখ কটমট করে চেয়েছে। এই কি ওঁর অদৃশ্য চোখ ?

উনি এখন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন আমাকে আর ইন্দ্রনাথকে। সোনার চড়া থেকে নৌকো ফিরিয়ে এনে জিপ ভাড়া নিয়েছেন। ওঁর ইচ্ছে ছিল, সেই রাতেই বেরিয়ে পড়া। কিন্তু বেঁকে বসেছিল ইন্দ্রনাথ। বিদেশ বিভুঁইয়ে অজানার অভিযানে রাতে বেরনো সমীচীন নয়। ফলে ভদ্রলোক সারারাত ছটফট করেছেন। এ হোটেলে আর ঘর না থাকায়, একটা ঘরেই রাত কাটিয়েছি তিনজনে। সমস্ত রাত ঘুমের ঘোরে উনি চেঁচিয়ে গেছেন লাও ভাষায়, তর্জন-গর্জন করেছেন, এই মারেন কি সেই মারেন করে রাত ভোর করে দিয়েই আমাদের ঠেলে তুলেছেন, "চলুন, চলুন, কলসি-মাঠে এবার হানা দেওয়া যাক।"

কোনওমতে কলঘর থেকে বেরিয়ে ধড়াচূড়া পরতে-পরতেই নেমে এসে উঠে পড়েছি জিপে। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে চার চাকার যন্ত্রযান। এবং সেই প্রথম সটান প্রশ্ন করেছে ইন্দ্রনাথ, "মশাই কি এবার বলবেন, কোথায় যাচ্ছেন ?"

জুলজুল করে তাকিয়ে বোসবাবু বলেছেন, "বলতে কি বাকি রেখেছি ?"

"কিস্‌সু বলেননি। শুধু কলসি-মাঠ, কলসি-মাঠ বলে চেঁচাচ্ছেন।"

"ও হো! মাথার ঠিক নেই সার। পাগল-পাগল মনে হচ্ছে নিজেকে।"

মনে-মনে আমি বললাম, 'খাস পাগল তুমি! বদ্ধ পাগল, উন্মাদ কোথাকার! সাইকিক না ঘেঁচু! খুবই লটঘটে কেস!'

মুখে কুলুপ এঁটে রইলাম ইন্দ্রনাথের দাবড়ানির ভয়ে।

বোসবাবু বলে গেলেন, "ওই জালাটা দেখেই হঠাৎ মাথার মধ্যে খেলে গেল একটা আইডিয়া।"

"কিসের আইডিয়া ?"

"ইন্দ্রনাথবাবু, এমন একটা জায়গায় আপনাদের এখন নিয়ে যাচ্ছি যা দু'হাজার বছর ধরে অনেক রহস্য সৃষ্টি করে রেখেছে। অনেক পণ্ডিতকে ভাবিয়ে তুলেছে, কিন্তু কেউই আজ পর্যন্ত সেগু'লোর সমাধান করতে পারেনি। দিন, নস্যি দিন।"

নস্যির ডিবে বাড়িয়ে দিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ, "দু'হাজার বছরের রহস্য ?"

"আজ্ঞে।" শব্দ করে নস্যি নিলেন বোসবাবু, "লাওসের ঠিক মাঝখানের উপত্যকায় দু'হাজার বছর ধরে রয়েছে অগুনতি জালা। বালিমাটি দিয়ে তৈরি বিশাল-বিশাল কলসি। এত কলসি কারা বানিয়েছে, কেন বানিয়েছে, তা কেউ হাজার গবেষণা করেও আঁচ করে উঠতে পারছে না। আমরা যাচ্ছি সেইখানেই।"

"কলসি-মাঠে গুপ্তধনের খোঁজে ?"

"আজ্ঞে। আমার মন বলছে, পান্না-বুদ্ধদের লুকিয়ে রাখা হয়েছে ওই কলসিগুলোর মধ্যে," বলতে-বলতে চোখ জ্বলে উঠল বোসবাবুর।

পাগলের চাহনি মনে হচ্ছে ?

আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি কলসি-মাঠে।

এ-এক আশ্চর্য প্রান্তর। আমার চোখে তা অপূর্ব। ধু-ধু ধূসরাভা আর সবুজাভা মেশানো মূর্তিমান নির্জনতা যদি কিছু থাকে, তবে তা এই কলসি-মাঠ। মানুষসমান উঁচু-উঁচু ঘাস কোথাও রোদে জ্বলে হলুদ হয়ে নেতিয়ে পড়েছে, কোথাও সতেজ সবুজ আকারে মাথা উঁচিয়ে হাওয়ায় দুলছে। উঁচু-নিচু এবড়ো-খেবড়ো প্রান্তরের বহু দূরে ধূসর ন্যাড়া টিলার পর টিলা। গাছপালার চিহ্ন নেই কোথাও। অতিকায় কলসিগুলোকে তাই আরও দানবিক মনে হচ্ছে।

প্রত্যেকটা কলসি আটফুট উঁচু। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা। হাইটে গরমিল নেই কোথাও। এ-পর্যন্ত যত কলসির হাইট মেপেছি, সবই পাক্কা আটফুট উঁচু। মুখের বেড় প্রত্যেকের ছাব্বিশ ফুট। এ-মাপেও হেরফের নেই এক ইঞ্চিও। যে ক'টার মুখের মাপ নিতে পেরেছি কলসির মাথায় চেপে, সবক'টাই পাক্কা ছাব্বিশ ফুট।

একটা কলসির মাথায় দাঁড়িয়ে দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরভরা কলসি-সমারোহের দিকে তাকিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছি। এ কী পাগলামি, না, উদ্ভট পরিকল্পনামাফিক অবিশ্বাস্য সৃষ্টির প্রয়াস ? যতদূর চোখ যায়, একই মাপের কলসি দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেছে। দেখতে তাদের উনুনের মতো চৌকোনো। গায়ে শ্যাওলা আর রকমারি বুনো ফুল। কোনওটা ভেঙে পড়েছে, কোনওটা আস্ত রয়েছে। দু'হাজার বছরের বিস্ময়কে নিজের বুকে ধরে রেখে অটুট রয়েছে।

চেয়ে থেকেছি অবাক বিস্ময়ে, আর মাথার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে বোসবাবুর মায়ের শেষ কথাটা, "কলসির মাঠে দৈত্যদের উনুন··· কলসির মাঠে দৈত্যদের উনুন!"

বিমূঢ়ভাবে নেমে এসে ইন্দ্রনাথের সামনে দাঁড়াতেই ও তাকাল বোসবাবুর দিকে, "কোথায় আছে গুপ্তধন ?"

বোসবাবু তখন মাথা চুলকোচ্ছেন। অগুনতি কলসি দেখে ঘাবড়ে গেছেন বোঝাই যাচ্ছে। হাঁ করেছিলেন জবাবটা দেবেন বলে, তার আগেই দুম্ করে একটা আওয়াজ হল। প্রান্তরের ওপর দিয়ে দিকে-দিকে ছড়িয়ে গেল সেই আওয়াজ। চমকে আওয়াজের উৎসের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম, দূরের একটা বিশাল জালার পেট ফেটে চৌচির। পাকসাট খেতে-খেতে কী একটা জিনিস তার ভেতর থেকেই ঠিকরে যাচ্ছে ওপর দিকে। অনেক উঁচুতে উঠেই আবার সেটাও ফেটে গেল দমাস্ করে। একতাল সাদা ধোঁয়া আর আগুনের ঝলক থেকে চারপাশে ছড়িয়ে গেল কুচো কাগজ।

জালার ভূত

"শেরপা থুঙ! শেরপা থুঙ!" কানের কাছে অকস্মাৎ বিকট চিৎকারে ভয়ানক চমকে উঠলাম। বোসবাবু তখনও উন্মাদের মতোই চোখ ঠেলে বের করে চেঁচিয়ে যাচ্ছেন, "শেরপা থুঙ! বদমাশ, এখানেও ঠিক এসেছে। লুটে নিয়ে গেল··· লুটে নিয়ে গেল আমার পান্না-বুদ্ধ!"

আমি তক্ষুনি ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে ঘুরে-ঘুরে চেয়ে ছিলাম শেরপা থুঙ নামক সেই বিভীষিকাময় প্রাণীটির সন্ধানে। যাকে আজ পর্যন্ত চোখে দেখিনি, কিন্তু যার অবর্ণনীয় পৈশাচিক কাণ্ডকারখানার অনেক বর্ণনা শুনেছি বোসবাবুর মুখে।

কিন্তু কোথায় সেই আপদ ? নীল আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে কুচো কাগজ, উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায় ধোঁয়ার সঙ্গে-সঙ্গে।

চোখ পড়ল ইন্দ্রনাথের চোখের ওপর। দু'হাত পেছনে মুঠি পাকিয়ে ধরে সে নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে ফেটেফুটে যাওয়া দানবাকার কলসিটার দিকে। হাওয়ায় তার কোঁচা লটপট করছে, পাঞ্জাবির কোণ উড়ছে, মাথার লম্বা চুল চোখে-মুখে-কপালে লেপটে যাচ্ছে। ইন্দ্রনাথ সুপুরুষ, ইন্দ্রনাথ নিখাদ বাঙালি, ইন্দ্রনাথ সুপ্ত বলিষ্ঠতার রহস্যময় আধার। কলসি-মাঠের খাঁ-খাঁ প্রান্তরে ওকে আজ আরও সুন্দর,

আরও ব্যক্তিত্বময় লাগছে।

আমি বললাম, "ইন্দ্র, ও কী ?"

"দো-বোমা, একটু বড় সংস্করণ," স্বপ্নিল চোখে তাকিয়ে থেকে বললে ইন্দ্রনাথ।

"কে ফাটাল ? শেরপা থুঙ ?"

চোখের স্বপ্ন কেটে গেল নিমেষে। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসল ইন্দ্রনাথ। বললে, "বোসবাবু এখন সর্বত্র শেরপা থুঙকে দেখছেন।"

অমনি তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বললেন বোসবাবু, "বললেই হল ? বললেই হল ? বলুন, তবে কে ফাটাল দো-বোমা ? কে উড়িয়ে দিল কলসি ?"

কথা শেষ হতে-না-হতেই ডান দিকে আবার একটা বিস্ফোরণ ঘটল। থরথর করে কেঁপে উঠল পায়ের তলার মাটি। রাশিরাশি মাটি আর ঘাস ছিটকে গেল শূন্যে। ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি দূরে মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই আবার একটা বিস্ফোরণ ঘটল ডান দিকে।

এবার আর কলসি ফাটছে না, মাটির মধ্যে বোমা ফাটছে !

ভয় পেলাম প্রচণ্ড। আমার চাইতেও বেশি ভয় পেয়েছেন বোসবাবু। কাঁপছেন ঠকঠক করে।

ঠিক এই সময়ে জিপের ড্রাইভার দৌড়ে এল ওপরে। তাকে নীচে অনেক দূরে রেখে এসেছিলাম। হাউমাউ করে সে যা বললে, বোসবাবুর তর্জমায় তার মানেটা এই গত যুদ্ধের অনেক বোমা এখানেও রয়েছে আ-ফাটা অবস্থায়। একটার পর একটা ফেটে চলেছে সেইগুলোই।

পায়ের চাপেই ফেটে যেতে পারে ...সুতরাং...সুতরাং আমরা পালিয়ে এলাম।

রাত নিশুতি। সারাদিনের অভিযানে জিপের নাচুনি আর ঝাঁকুনিতে জান কয়লা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। গায়ে-গতরে ব্যথা। দুটো ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তক্ষুনি।

ঠেলে তুলে দিয়েছিল ইন্দ্রনাথ। ঘর অন্ধকার। চোখ মেলে অন্ধকারেই বুঝলাম, ইন্দ্রনাথ ঝুঁকে পড়েছে আমার ওপর।

কানের কাছে বললে আস্তে-আস্তে, "উঠে পড়, বেরোতে হবে।"

আচমকা ঘুম ভাঙলেও এসব পরিস্থিতিতে চমকে না-ওঠাটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। কম অ্যাডভেঞ্চার করিনি আমার এই পাগলা বন্ধুটির সঙ্গে। সহজভাবেই তাই বললাম, "কেন ? কোথায় ?"

ও বললে, "বোসবাবু এক্ষুনি বেরিয়ে গেলেন।"

এবার কিন্তু ধড়মড় করে উঠে বসলাম, "সে কী !"

"চলে আয়, চলে আয়, চটপট !"

একটা ঘরেই পাশাপাশি তিনটে খাটে শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল এই হোটেলে, আগেই তা বলেছি। একটা খাট খালি, বোসবাবু উধাও হয়েছেন।

কোনওরকমে ধড়াচূড়া এঁটে দৌড়ে নেমে এলাম ইন্দ্রনাথের পেছন-পেছন। একতলার রিসেপশন কাউন্টারের ক্লার্ক একটা পেপারব্যাক উপন্যাস পড়ছিল। ইংরেজিতে শুধোল ইন্দ্রনাথ, "মিঃ বোস এক্ষুনি বেরোলেন ?"

"ও ইয়েস।"

"কোথায় ?"

"টুওয়ার্ডস দ্য প্লেন অব জার।" অর্থাৎ কলসি-মাঠের দিকে।

"কোনও গাড়ি নিয়ে গেলেন ?"

"হোটেল-জিপ।"

"আর একটা জিপ হবে ?"

"ও ইয়েস।"

আমরা রাত্রি-নিশীথে চলে এলাম কলসি-মাঠের নির্জনতায়।

কলসি-মাঠ জায়গাটা রাস্তা থেকে ভেতর দিকে পাহাড়ি উপত্যকার ওপর। বেশ খানিকটা হেঁটে যেতে হয়। তারপর পাথর টপকে-টপকে ওপরে উঠতে হয়। দিনের বেলাতেই কালঘাম ছুটে গেছিল। রাতের অন্ধকারে এ-কাজ করতে হবে ভেবেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। কিন্তু ইন্দ্রনাথের শক্ত চোয়াল আর কঠোর চোখ দেখে ট্যাঁ-ফুঁ করিনি।

বিশাল একটা গোল পাথরের আড়ালে হোটেলের আগের জিপটা দাঁড়িয়ে ছিল। একগাল হেসে ড্রাইভার আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল কোন পথ দিয়ে গেছেন বোসবাবু।

আমরাই গেলাম সেই পথে।

জালার পর জালাগুলো অতিকায় দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে ছিল দিগন্ত পর্যন্ত। তারার আলোয় এ-মাঠের দৃশ্য যে এত স্পষ্ট দেখা যাবে, তা তো ভাবিনি। প্রত্যেকটা দানবিক কলসিকে এক-একটা জমাট নিরেট ছায়া বলেই মনে হচ্ছে। নিঝুম রাতে তাদের বিদঘুটে আকৃতিগুলোই গা কাঁপিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট।

জোর হাওয়া বইছে। মানুষ-সমান পেল্লায় ঘাসগুলো নুয়ে-নুয়ে পড়ছে। আর সেই সঙ্গে প্রান্তর জুড়ে অপার্থিব খসখস মড়মড় আওয়াজ হয়েই চলেছে। মাথার ওপরে কোটি-কোটি ঝকঝকে নক্ষত্র বোবা বিস্ময়ে যেন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে কলসি-মাঠের অজানা বিভীষিকাকে।

অজানা বিভীষিকা নিঃসন্দেহে। কেননা, আমরা দুই মূর্তি বেড়ালের মতো নিঃশব্দে পাথর টপকে-টপকে ওপরে উঠে আসতেই স্পষ্ট শুনলাম ডান দিকে একটা অমানুষিক অট্টহাসি। বুকটা ধড়াস করে উঠতেই অনেক দূরে প্রান্তরের শেষের দিকে একটা পৈশাচিক আকৃতি আলোর দেহ নিয়ে ভেসে উঠল শূন্যে। শূন্যেই একটু-একটু করে অন্ধকারে ভরে গেল তার আলোর দেহ।

আর তার ঠিক পরেই সামনের বড় কলসিটার মাথার ওপরে ঝলসে উঠল একটা আলো, উঁকি দিল একটা মুণ্ড। নরমুণ্ড নিঃসন্দেহে, আলোর আভায় সেটুকু দেখেছি স্পষ্ট, পরক্ষণেই তার পাশের জালার বিশাল পেট থেকে একটা প্রকাণ্ড দানো দুলে-দুলে উঠে এল বাইরে। তার বিশাল পেট, চর্বিঝোলা ইয়াব্বড় মুখ ও লিকলিকে হাত আর পা থেকে টস্‌টস্ করে ঝরে পড়ছে তরল আগুন !

আবার সেই অমানুষিক অট্টহাসি। প্রান্তরের দিকে-দিকে ছড়িয়ে গেল সেই রক্তজলকরা হাসি। হাসির দমকে-দমকে দুলে-দুলে ফুলে-ফুলে উঠল কলসির মাথায় পিশাচমূর্তি।

আর বুকফাটা আর্তনাদ করে এদিককার কলসির মাথা থেকে ঠিকরে এল নরমুণ্ডের মালিক !

আমাদের বোসবাবু ! হাতে তাঁর জ্বলন্ত টর্চ !

সাপের বিছানা

আবার আমরা উড়ে চলেছি আধুনিক পুষ্পকরথে চেপে। গোমড়া মুখে জানলার পাশেই বসে আছেন বোসবাবু। তাঁর দিকে খরনজর রেখেছি আমি। লোকটাকে আর বিশ্বাস নেই। উড়ন্ত প্লেন থেকেও লাফিয়ে পড়তে পারেন। মাথায় ছিট আছে, এ-বিশ্বাস আমার মাথায়

আরও গেড়ে বসেছে কলসি-মাঠের লোমহর্ষক কাণ্ডকারখানার পর থেকেই।

খলখল হাসি শুনে আর শূন্যে ভাসমান পিশাচমূর্তির গায়ে গড়িয়ে পড়া তরল আগুন দেখে, বোসবাবু চেঁচাতে-চেঁচাতে হাত-পা ছুঁড়ে লাফিয়ে পড়েছিলেন কলসির মাথা থেকে। ভাগ্যিস আমরা দৌড়ে গিয়েছিলাম, তাই আট ফুট ওপর থেকে পড়ে গিয়েই মাথা ভাঙেননি ভদ্রলোক। লুফে নিয়েছিলাম .আমরা।

তারপরেই তাঁকে চ্যাংদোলা করে বয়ে নিয়ে এসেছিলাম নীচে। আসতে কি চান? কী চিৎকার! কী চিৎকার! চিৎকারের বিষয় একটাই, ভূত-প্রেতরা আগলে রেখেছে পান্না-পাথরের বুদ্ধদের! ভয়ের চোটে পালিয়ে এলে লাভ হবে অষ্টরম্ভা!

পায়ের তলায় বোমা ফাটলে যে কী হবে, সেটাই আমরা ওঁর মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করেছি। হোটেলে এনে ফেলে সারারাত দু'জনে পাহারা দিয়েছি। যেরকম পাগলের মতো চেঁচাচ্ছেন আর লাফাচ্ছেন, বারান্দা থেকেও ছিটকে পড়তে পারেন। ভোরের দিকে ঘুমে নেতিয়ে পড়তেই ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তুই ভূত-প্রেত মানিস?"

হেঁয়ালি করে ইন্দ্রনাথ বলেছিল, "আমার মানা আর না-মানায় কার কী এসে যায়?"

রেগে গিয়ে বলেছিলাম, "সোজা কথার সোজা জবাব দে। কলসির মাঠে ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা সব সত্যি?"

"কী ঝামেলা! প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অবিশ্বাস করা যায়?"

ঘণ্টা কয়েক ঘুমিয়ে উঠেই গোঁ ধরেছিলেন বোসবাবু, "এবার দক্ষিণে।"

"সেটা কোন চুলোয় ?" বলেছিলাম কাঠখোট্টা গলায়।

"কথার ধরন শুনলে গা জ্বলে যায়," খ্যাঁক করে উঠেছিলেন বোসবাবু, "দক্ষিণ মানে যমের দক্ষিণ দুয়ারে নয় মশাই, লাওসের দক্ষিণে।"

"কেন ?"

"আঃ গেল ! এসেছি কেন এখানে ? বুদ্ধ··· বুদ্ধ··· পান্না-বুদ্ধ রয়েছে দক্ষিণে··· পষ্ট টান অনুভব করছি মনের মধ্যে !"

"শিকেয় তুলে রাখুন আপনার মনের টানকে," তিড়বিড়িয়ে উঠেছিলাম আমি, "রাত-বিরেতে ভূতের মাঠে মরতে গেছিলেন কি মনের টানে ?"

"তা ছাড়া আবার কী ? কে যেন মনের মধ্যে বললে, 'ওরে আয় ! ওরে আয় ! ওরে আয় !' তাই তো ছুটলাম।"

"তারপর কলসির মাথা থেকে লাফিয়ে পড়লেন ?"

"লাফিয়ে তো পড়িনি !"

"তবে···"

"ঠেলে ফেলে দিল।"

"কে ?"

চোখ-মুখ কেমন যেন হয়ে গেল বোসবাবুর, "তাদের দেখা যায় না মৃগাঙ্কবাবু !"

আমরা এসে গেছি এখন লাওসের দক্ষিণ অঞ্চলে। কেন যে এই অঞ্চলকে নিয়ে কবিরা এত কলম চালনা করেন, আকাশ থেকেই তা মালুম হচ্ছে আমার। গোটা চাম্পাসাক প্রদেশটাকে প্রকৃতিদেবী যেন নিজের হাতে মনের মতো করে সাজিয়েছেন। এত সৌন্দর্য বাংলা ছাড়া আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। রুট থার্টিন সড়কের সেতুগুলো যে নতুন তৈরি, তা এত উঁচু থেকেও বেশ বোঝা যাচ্ছে। বোসবাবুর মনমরা ভাবটাও কমেছে। বিড়বিড় করে জ্ঞান দিয়ে গেলেন আমাকে, "সোভিয়েত দেশ আর পুব জার্মানির টাকায় তৈরি সেতু মশাই। এই গেল আপনার রুট থার্টিন। ওই দেখুন রুট নাইন। দুটো ভাগ হয়ে গেছে, দেখেছেন ?"

"দেখতেই তো পাচ্ছি," মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকে বলেছিলাম।

"একটা রাস্তা গেছে সোজা পুব দিকের ভিয়েতনামে, আর-একটা দক্ষিণ চিন সাগরে।"

"রাস্তায় পিচ ঢালাই চলছে এখনও ?"

"চলছে গত-বছর থেকেই, খুবই গুরুত্বপূর্ণ সড়ক মৃগাঙ্কবাবু। রাশিয়া থেকে পেট্রল আসছে এই রাস্তায়। লাও কাঠের গুঁড়ি যাচ্ছে রাশিয়ায়।"

"মেকং নদী এখানে এত চওড়া ?"

"পাক্কা এক মাইল চওড়া। ভাবতে পারেন ?"

ভাবাটা সত্যিই শক্ত। মেকং যেখান থেকে শুরু হয়েছে, সেখানে সোনার চড়া দেখে এসেছি। সেখানে তার এক রূপ, ক্ষীণ, কিন্তু বন্য। এখানে বিশাল এবং ঢলঢলে। চোখ জুড়িয়ে যায়।

এই মেকং নদীর বুকেই শুরু হল আমাদের শেষের অভিযান। এবং সেই অভিযানের শেষে যে এত পিলে চমকানো ব্যাপার ছিল, তা কল্পনাও করতে পারিনি।

নৌকোয় চাপার আগে থেকেই বোসবাবুর মাথার পোকা নতুন করে নড়ে উঠেছিল। প্লেন থেকে নেমেই চিংড়ি মাছের মতো লাফাতে লাগলেন, "জলদি ! জলদি ! শেরপা থুঙের আগেই পৌঁছতে হবে।"

"কোথায় আপনার শেরপা থুঙ ?" কড়া গলায় বলেছিলাম আমি, "প্লেনে কোনও শেরপাকে দেখিনি।"

"মৃগাঙ্কবাবু, আপনি কি মনে করেন, আপনাকে চেনা দেবার জন্য শেরপা থুঙ শেরপার চেহারা নিয়ে প্লেনে উঠেছিল ? সে ছদ্মবেশী বহুরূপী।"

"আপনি চিনেছেন ?"

"চিনতেই যদি পারব, তা হলে তাকে বহুরূপী বলব কেন ?"

বাধা দিয়ে ইন্দ্রনাথ বলেছিল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন কোথায় যাবেন ?"

"যাব যেখানে, সেখানে সোজা পথে যাব না।"

"মানে ?"

"মানে, একটু ঘুরে যাব।"

"তাই ঘুরুন না, কিন্তু দয়া করে বলুন, কিসে চাপবেন ?"

"হাতিতে।"

হ্যাঁ, হাতিতেই চেপেছি আমরা। মেকং নদীর দক্ষিণ তীরে যে বিশাল জঙ্গল, হাতি চলেছে সেই পথে। মাহুতকে বোসবাবুই বুঝিয়ে দিয়েছেন, কোথায় যেতে হবে। গদাইলশকরী চালে ঝোপঝাড় মাড়িয়ে হাতি মহাশয় চলেছে সেই দিকেই। একই হাওদায় পিঠে পিঠ দিয়ে বসে আছি তিনজনে। খুশিতে বোসবাবুর প্রাণ এখন গড়ের মাঠ। তিনি বলছেন, "জানেন মৃগাঙ্কবাবু, এই জঙ্গলে অনেক ভাল-ভাল খাবার পাওয়া যায়।"

"খিদে পেয়েছে মনে হচ্ছে ?" দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিলাম। হাতি চললে যে এত দোলে, তা জানলে হাতির পিঠে আমাকে কেউ তুলতে পারত না। বমি না করে ফেলি !

"খিদে ? পেলেও সে খাবার আপনি-আমি খেতে পারব না।"

"আমি না পারলেও আপনার অখাদ্য কিছু আছে বলে তো মনে হয় না।"

"হাঃ হাঃ হাঃ ! তা যা বলেছেন ! হাজার হলেও এইসব অঞ্চলেই আমার মা বড় হয়েছেন। শূকর আর হরিণ তবুও গিলতে পারি ; পাইথন পেটে ঢোকে না।"

"পাইথন ?"

"এখানকার লোকের বড় প্রিয় খাদ্য, দেদার পাওয়া যায় এই জঙ্গলে। ওই এসে গেছে হাতিদের গ্রাম।"

"হাতিদের গ্রাম ?" দূর থেকে খানকয়েক পাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘর দেখতে পেলাম। "হাতিদের তৈরি ঘর নাকি ?"

"দূর মশাই ! হাতি কি ঘর বানায় ? হাতি যারা ধরে, কাঠ বইতে ট্রেনিং দেয়, তারপর চড়া দামে বেচে দেয়, এ-ঘর তাদের তৈরি।"

"ও ! নাম কী গ্রামটার ?"

"ফাফো।"

"খাসা নাম। চলুন, হাতি-ধরিয়েদের মুখেই হাতি ধরার গল্প শোনা যাক। পিঠের শিরদাঁড়াটাকে একটু জিরেন দেওয়াও হবে।"

"আজ্ঞে না। দেরি হয়ে যাবে। তা ছাড়া, ওরা এখন জঙ্গলে। বাচ্চা হাতি ধরে এনে যখন বড় করবে, তখন আসবেন'খন। এই··· এই···" বলেই মাহুতকে গড়গড় করে লাও ভাষায় কীসব বলে গেলেন বোসবাবু। হাতি অমনি বাঁয়ে ঘুরে আরও গভীর জঙ্গলের মধ্যে মড়মড় করে ডালপালা ভেঙে ঢুকে পড়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেল এক টুকরো খোলা জমির সামনে।

হাওদায় বসে আমরা দেখলাম, রোদ এসে পড়েছে মাটির ওপর। সেখানে চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে বিশালকায় এক পাথরের বুদ্ধ। মূর্তির বুকে, হাতে, পায়ে, কপালে এবং চারপাশে কিলবিল করছে অসংখ্য সাপ।

সবই কিন্তু পাথরের সাপ !

"নামুন ! নামুন ! নেমে পড়ুন !"

চমকে উঠেছিলাম বোসবাবুর চিৎকারে। মাহুতও হাতিকে বসাচ্ছে মাথায় ডাঙস মেরে। তাল সামলাতে না পেরে আর একটু হলে ঠিকরে যাচ্ছিলাম।

শক্ত হাতে ইন্দ্রনাথ চেপে ধরল আমাকে পেছন থেকে। হাতি ততক্ষণে নাগরদোলা দুলুনি বন্ধ করে বসে পড়েছে।

সড়াত করে হড়কে নেমে গিয়ে পাথরের সাপেদের দিকে দৌড়তে দৌড়তে তারস্বরে চেঁচাতে লাগলেন বোসবাবু, "আছে··· আছে··· এখানেই আছে··· আমার মন বলছে এখানেই আছে !"

আমাকে ধরে হাতির গড়ানে পিঠ থেকে নেমে এসে ইন্দ্রনাথ বললে, "কোথায় আছে ?"

এই প্রথম শুনলাম জলদগম্ভীর গলায় কথা বলছে ইন্দ্রনাথ। ভোজবাজির মতো শুধু ওর কণ্ঠস্বরই পালটায়নি, পালটেছে চোখ-মুখের চেহারাও। চোখে যেন হিরে জ্বলছে, চোয়াল হয়েছে শক্ত।

নিস্তব্ধ জঙ্গল গমগমে গলার আওয়াজের অদ্ভুত ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির রেশ তুলে যেন আরও নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন বোসবাবু। আস্তে-আস্তে ঘুরে দাঁড়ালেন। দুই চোখ আশ্চর্য প্রদীপ্ত। সুস্থ লোকের চোখে এমন চাহনি তো দেখা যায় না।

উনি এখন দাঁড়িয়ে আছেন ইয়া মোটা একটা সাপের পিঠে পা তুলে দিয়ে। সাপের পিঠে পা ঠুকতে-ঠুকতে বললেন দাঁত কিড়মিড় করে, "এর তলায়··· এদের তলায়··· মাটি খুঁড়লেই···"

অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা ঘটে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। নড়ে উঠল পাথরের সাপ।

তীব্রস্বরে চিৎকার করে উঠল ইন্দ্রনাথ, "পাইথন ! পালান, বোসবাবু।"

পাইথনই বটে। ময়লা পাথরের পাইথনদের সঙ্গে গা মিলিয়ে অসাড়ে পড়ে ছিল একটা জ্যান্ত পাইথন। বোসবাবুর পায়ের আঘাতে সে ক্ষুব্ধ হয়েছে।

পর-পর তিনবার গুলিবর্ষণের শব্দ শোনা গেল পরমুহূর্তেই। করাল ময়ালের মাথা উড়ে গেল তিন-তিনটে বুলেটে।

আচ্ছন্নের মতো শুধু দেখলাম, ধূমায়িত রিভলভার হাতে হরিণের বেগে বোসবাবুর দিকে ছুটে যাচ্ছে ইন্দ্রনাথ।

গুলতির দানো

তরতরিয়ে নৌকো ছুটছে তীরের দিকে। মেকং নদী এখানে আরও চওড়া। এপার থেকে ওপার ঠাহর করা যায় না। তাই ওপার থেকে নৌকোয় চেপে বুঝতে পারিনি এপারের রাজারাজড়ার কাণ্ডকারখানা।

জঙ্গল থেকে বেরিয়েছি অক্ষত দেহে। গুলিবর্ষণের পরেও মৃত পাইথনের পাকসাটের মধ্যে নির্ঘাত মারা যেতেন বোসবাবু। মরা সাপ যে এত আছাড় খায়, কুণ্ডলি পাকায়, তা না-দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। ধুলো উড়ছে, ঘাস টুকরো-টুকরো হয়ে উড়ে যাচ্ছে, লেজের ঝাপটায় ঠিকরে পড়েছেন বোসবাবু। পাথরের বুদ্ধ তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল বলেই রক্ষে। ঝপ করে জ্ঞানহীন দেহটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে এঁকেবেঁকে পালিয়ে এসেছিল ইন্দ্রনাথ।

তারপর হাতির পিঠে চেপে এলাম নদীর ধারে। ততক্ষণে জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন বোসবাবু। বিড়বিড় করে বকে যাচ্ছেন, "শয়তানে টেনেছিল··· ওঃ ! পাথরের সাপও জ্যান্ত হয়ে গেল ?"

ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল ইন্দ্রনাথ, "আপনার ছোঁয়া পেয়েই জ্যান্ত হয়ে গেল। পান্না-বুদ্ধদের পাহারাদার তো !"

"কচু পাহারাদার ! পান্না-বুদ্ধ ওখানে নেই।"

"তখন যে বললেন, ওখানেই আছে !"

"ভুল, ভুল, শয়তানে ভুল করিয়েছে। পেছনে ভূত লেগেছে মশাই।"

"তা হলে, এবার দেশে ফেরা যাক ?"

"পাগল !"

"মানে ?"

"ওয়াট ফু, ওয়াট ফু, নদী পেরোলেই ওয়াট ফু।"

"হুঁ ! সেখানে কী ?"

চোখ কপালে তুলে বললেন বোসবাবু, "সে কী মশাই ? ওয়াট ফু সম্বন্ধে এত গাওনা গাইলাম, সব ভুলে গেলেন ?"

বিচিত্র হেসে ইন্দ্রনাথ বলেছিল, "আপনার গাওনা কিনা— মনে রাখা কঠিন। ফুঁ যাবেন ?"

"ফুঁ নয়, ফুঁ নয়, ফু, মানে মঠ। ওয়াট ফু লাওসের সবচেয়ে নামী মঠ। রাজার তৈরি বৌদ্ধ মঠ, দেখলে মুণ্ডু ঘুরে যাবে মশাই।"

"তাই নাকি ? কোন রাজার তৈরি ?"

"খমির রাজা, খমির রাজা, এখান থেকে ১৬৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজত্ব ছিল যাঁদের।"

"১৬৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে !" ভুরু কুঁচকোয় ইন্দ্রনাথ, সেখানে তো আঙ্কোর রাজ্য।"

"হ্যাঁ··· হ্যাঁ···হ্যাঁ ! ঠিক জানেন, কিন্তু জানেন না মৃগাঙ্কবাবু। বলেছিলাম না, ওইখান থেকেই যত গণ্ডগোল ? কী কুক্ষণে বলে ফেলেছিলাম, ব্যাঙ্ককের আসল পান্না-বুদ্ধ ব্যাঙ্ককে নেই, আছে ওয়াট ফু-তে। সেই থেকে লাইফটাকে হেল করে ছাড়ল ব্যাটা শেরপা থুঙ।"

"তা হলে তো সেখানে যেতেই হয়।"

ওয়াট ফু মঠের ভগ্নদশা দেখলাম নদীর বুক থেকে। রাজাদের নজর ছিল বটে। এলাহি কাণ্ড করে ছেড়েছেন পাথর দিয়ে। আঙ্কোরভাটের মন্দির এখন জগদ্বিখ্যাত। সেই দেশের রাজারাই নাকি রাশিরাশি পাথর এনে নদীর ধার থেকে গড়ে তুলেছিলেন প্রকাণ্ড এই মঠ। বৌদ্ধ মঠ। আঙ্কোরভাটের হিন্দু মন্দিরের বিশালত্বকে ম্লান করার জন্য কী ?

ভেঙে-ভেঙে পড়ছে অতীতের বিস্ময়, কিন্তু আজও তা বিপুল বিস্ময় হয়ে জেগে রয়েছে চোখের সামনে। সাতশো ফুট লম্বা পাথরের সিঁড়ি ধাপে-ধাপে উঠে গেছে জলের কিনারা থেকে। দু' পাশে সারবন্দী অজস্র রঙিন ফুলের গাছ। সিঁড়ি উঠে গেছে বিশাল মন্দিরের পাদদেশে। মাঝে পড়ছে পটমণ্ডপ। তাদের গঠন এত সুন্দর যে, মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে হয়। নদীর বুক থেকে বিরাট এই সৃষ্টি দেখে স্তম্ভিত হয়ে শুধু ভেবেছি, এত মেহনত করেও তো শেষরক্ষা করা গেল না। মহাকাশ কুটিল হাসি হেসে ভেঙেচুরে একশা করে দিচ্ছে প্রতিটি পাথরকে।

আচমকা আমার দিবাস্বপ্ন খানখান হয়ে গেল বোসবাবুর ভাঙা কাঁসি বাজনার মতো খ্যানখেনে চিৎকারে। কানের কাছে বিশ্রী বিকটভাবে চেঁচিয়ে চলেছেন তিনি, "না, না, না !"

গোটা ওয়াট ফু তখন যেন দুলছে। আসলে দুলছে আমাদের নৌকো। আমি আধবোজা চোখে তন্ময় হয়ে চেয়ে ছিলাম সেই অপরূপ শোভার দিকে। এমন সময়ে কানের পরদা যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল বিতিকিচ্ছিরি চিৎকারে।

"না ! না ! না !"

এতক্ষণে এবং এতদিনে কড়া ধমক শুনলাম ইন্দ্রনাথের গলায়, "না মানে ?"

"ওখানে না ! ওখানে না ! ওখানে না !"

"ওয়াট ফু যাবেন না ?"

"না !"

"কেন যাবেন না ?"

"শেরপা থুঙ ! শেরপা থুঙ !"

"বাজে বকছেন কিন্তু !"

"অন্ধ নাকি আপনি ? দেখতে পাচ্ছেন না ? ওই দেখুন··· ওই, ওই, শেরপা থুঙ !"

সবিস্ময়ে আমি এবং আমার বন্ধুটি দু'জনেই চেয়ে ছিলাম বোসবাবুর আঙুলের নির্দেশ অনুসরণ করে। তর্জনী তুলে সাতশো ফুট লম্বা পাথরের সিঁড়ির ওপরের ধাপটিকে দেখাচ্ছিলেন। সাদা পাথরের বুকে লম্বমান কালো মূর্তিটাকে প্রথমে অতটা খেয়াল করিনি। বিশাল মঠের বিশালতায় তন্ময় হয়ে গেছিলাম বলে। এখন তাকে দেখতে পেলাম। অস্পষ্টভাবে হলেও বেশ বুঝলাম, সাদা সোপানে কালো আলখাল্লা মুড়ে দাঁড়িয়ে একজন বেঁটে মানুষ। তার মাথাতেও কালো টুপি, নেপালিদের মাথায় দেখা যায় এমনিই টুপি। দাড়ি-গোঁফের বালাই নেই। চোখে কালো চশমা। গায়ের রং ময়লা বলেই মনে হল।

সে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। সাতশো ফুট লম্বা সাদা সোপানে আর কোনও প্রাণী নেই, শুধু সে। নড়ছে না একটুও, হাওয়ায় উড়ে-উড়ে যাচ্ছে কালো আলখাল্লার কোণগুলো।

হঠাৎ সে হাত দুটো টেনে আনল আলখাল্লার তলা থেকে। ডান হাতটা আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বাঁ হাতটা ভাঁজ করে টেনে আনল পেছন দিকে।

খুব মৃদু একটা আওয়াজ শুনলাম, ফট্ !

সঙ্গে-সঙ্গে বুঝলাম, গুলতি ছুঁড়ল কালো মূর্তি। নদীর বুকের ওপর দিয়ে আমাদের নৌকোর দিকে ধেয়ে আসতে-আসতে গুলতি-নিক্ষিপ্ত বস্তুটা আচমকা ফুলে-ফেঁপে উঠে ভাসতে লাগল শূন্যে। হাওয়ার ধাক্কায় উড়ে এল আমাদের দিকেই। একটা বিকটাকায় দানো-মুখ !

"আঁ··· আঁ··· আঁ !" অজ্ঞান হয়ে গেলেন বোসবাবু।

বিরক্তমুখে পকেট থেকে রিভলভার বের করে এক গুলিতেই ভাসমান দানো-মুখকে ফুটিফাটা করে দিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ, "হাইড্রোজেন-ভর্তি বেলুন। কিন্তু শেরপা থুঙ গেল কোথায় ?" তাকে আর দেখা গেল না সিঁড়ির ওপর।

চার হাজার দ্বীপের গোলকধাঁধায়

বোসবাবু জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন বটে, কিন্তু আর তো তাঁকে রোখা যাচ্ছে না। পাগলের মতো ছটফট করছেন, চোখ গুলি-গুলি করে দশ দিকে তাকাচ্ছেন। যেন শেরপা থুঙ ভুত-প্রেতদের পাঠিয়ে দেবেন যে-কোনও দিক থেকে।

আরও দক্ষিণে চলে এসেছি আমরা এই নৌকোয় চেপে। মোটরবোট বলেই এত তাড়াতাড়ি আসা গেল। তাও রাশিয়ার উপহার। জল তোলপাড় করে ছুটছে জলকন্যার মতো। বোসবাবুর উদ্বেগ আর আতঙ্ক যেন মোটরবোটকেও পেয়ে বসেছে।

মেকং নদী এখানে পাঁচ মাইল চওড়া। আশেপাশে অগুনতি পাথর মাথা উঁচিয়ে রয়েছে জলের ভেতর থেকে। এ দেশে আসবার আগে লাওস সম্বন্ধে একটা বই পড়ে নিয়েছিলাম। তাতে পড়েছিলাম একটা কবিতা— 'চার হাজার দ্বীপের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরি হায় রে··· ।'

এই সেই চার হাজার দ্বীপের গোলকধাঁধা। জলে ডোবা পাথরগুলোর দৌরাত্ম্যে স্রোত দুর্বার হয়ে উঠেছে। ভয়ঙ্কর বেগে এঁকেবেঁকে অজস্র চোরাঘুর্ণি ছুটে চলেছে খ্যাপা ঘোড়ার মতো। মোটরবোট বলেই রক্ষে, নইলে স্রোতের টানে তলিয়ে যেতে হত কোনকালে।

কাম্পুচিয়ান বর্ডারের কাছাকাছি এসে গেছি আমরা। নদীর পাড়ে একটা কংক্রিটের মঞ্চ দেখতে পাচ্ছি। বেশ কিছু ট্যুরিস্ট সেখানে দাঁড়িয়ে দূরবিন চোখে কী যেন দেখছে।

বোসবাবুও দেখেছিলেন তাদের। দেখার সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ একদম স্থির হয়ে গেলেন। চকচক করে উঠল দুই চোখ। বললেন নিজের মনেই, "ঠিক দিকেই যাচ্ছি। ওরাও দেখতে পেয়েছে।"

নরম গলায় বললে ইন্দ্রনাথ, "আপনি তো জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই খালি বলছেন, আরও আগে··· আরও আগে। খোনেফাফেঙ জলপ্রপাতের কাছে।"

"এসে গেছে খোনেফাফেঙ। ডান দিকে দেখুন না মশাই, অন্ধ নাকি !"

হাওয়া উলটো দিকে বইছিল বলে এতক্ষণ জলের গজরানি কানে ভেসে আসেনি। বোসবাবুর নাচানাচি নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম বলে সেদিকে খেয়ালও করিনি। এখন দেখলাম।

ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না সেই দৃশ্যকে। ডান দিকে বেশ খানিকটা দূরে উঁচু-উঁচু পাথর আর পাহাড়ের মাথা টপকে টানা লম্বা লাফ মেরে ছিটকে আসছে সাত-সাতটা জলের ধারা। জলপ্রপাত অনেক দেখেছি, কিন্তু এরকম জলপ্রপাত তো কখনও দেখিনি। সপ্তপ্রপাতের এ-হেন মূর্তি স্বচক্ষে না দেখলে তো বিশ্বাসও করতে পারতাম না।

জলের টান সেদিকে বিপজ্জনক। পাক খেতে-খেতে ফুলে-ফুঁসে লক্ষ ফণা নাচিয়ে ধেয়ে চলেছে। ফেনা আর জলবাষ্পের মেঘে এর বেশি আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। আবছা কুহেলির আড়ালে মনে হচ্ছে যেন আরও বিস্ময়, আরও চমক লুকিয়ে রয়েছে যুগ-যুগ ধরে।

আপন মনে বলে চলেছেন বোসবাবু, "এইবার··· এইবার দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট।"

"কাদের দেখতে পাচ্ছেন, বোসবাবু ?" কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করল ইন্দ্রনাথ।

"দূরবিন দিয়েও ওরা যা দেখতে পাচ্ছে না, আমি তা দেখতে পাচ্ছি আমার মনের চোখ দিয়ে, ···মানিখোট ! মানিখোট !"

"মানিখোট ! কী বস্তু ?"

"একটা গাছ।"

"গাছ ?"

"ম্যাজিক-গাছ। দেখতে আহামরি কিছু নয়, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, প্যাকাটির মতো হাড় বের করা। পাতার বালাই নেই বললেই চলে। ওই তো, ওই তো ঝুলছে ফল, একটাই ফল।"

"ফল !"

"ম্যাজিক-মানিখোটের ফল। যে ফল খেলে বাঁদরও মানুষ হয়ে যায়। মানুষ খেলে কী হবে ? হাঃ হাঃ হাঃ ! ওই ফল এবার খাব আমি।"

"খাবেন··· খাবেন··· ? কিন্তু পান্না-বুদ্ধরা···"

"আছে, আছে। ম্যাজিক-মানিখোটের গোড়ায় একটা গর্ত, তার মধ্যে শোয়ানো রয়েছে রাশিরাশি পান্না-বুদ্ধ। দেখেছি, এবার দেখেছি তোমাদের। শেরপা থুঙকে এবার দেখিয়েছি কলা। জয়বাবা পান্না-বুদ্ধ !"

"মৃগাঙ্ক, ধর, ওঁকে..."

কাকে ধরব ? ইন্দ্রনাথের চিৎকার শুনে আমি খানিকটা হাওয়া খামচে ধরেছিলাম। বোসবাবু বানরের মতো বিরাট লম্ফ দিয়ে মোটরবোটের রেলিং টপকে গিয়ে পড়লেন পাকসাট খাওয়া জলের মধ্যে। দেখতে দেখতে ফেনা আর জলকণা-বাষ্পের মধ্যে হারিয়ে গেলেন।

পান্না-বুদ্ধর রহস্য

লোকটাকে যে এত ভালবেসে ফেলেছিলাম, তা যদি আগে বুঝতাম, তা হলে এত দুর্ব্যবহার করতাম না। অনেক মুখঝামটা দিয়েছি, অনেক কড়া কথা বলেছি, কে জানত মরীচিকার পেছনে ছুটে এইভাবে তিনি প্রাণটা খোয়াবেন ?

বোসবাবুর প্রাণহীন দেহটাও পাওয়া যাচ্ছে না। কোন্ চোরাপাহাড়ের খাঁজে আটকে রয়েছে, অতৃপ্ত আত্মা হয়তো এখনও পান্না-বুদ্ধদের স্বপ্ন দেখে চলেছে...।

খুবই মুষড়ে পড়েছিলাম এবং দেশে ফেরার জন্য বায়নাও ধরেছিলাম। কিন্তু বেঁকে বসেছিল ইন্দ্রনাথ। ওর নাকি এখনও কী কাজ বাকি আছে।

শেষকালে রেগেমেগে বলেছিলাম, "কিসের কাজ ? কার কাজ ? যিনি তোকে কাজে লাগিয়েছিলেন, তিনি তো সরে পড়লেন।"

"তুই কি বোসবাবুর কথা বলছিস ?"

"তবে কি কুইন ভিক্টোরিয়ার কথা বলছি ?"

"খুব রেগেছিস দেখছি। এখনও বুঝলি না কেন এসেছি এদেশে ?"

"এসেছিস তো পান্না-বুদ্ধদের উদ্ধারে।"

"উদ্ধারও করেছি।"

"অ্যাঁ !"

"অত লাফাসনি মৃগ, বারান্দার রেলিং নিচু, তিরিশ ফুট নীচে আছড়ে পড়লে..."

"ইন্দ্র ! ইন্দ্র ! পান্না-বুদ্ধদের ছায়াও দেখিনি আমি !"

"আমিও দেখিনি।"

"তবে যে বললি..."

"উদ্ধার করেছি তাঁদের। লুকনো জায়গা থেকে দলে-দলে বেরিয়ে এসেছেন তাঁরা !"

"ইন্দ্র ! আমার মাথা ঘুরছে, আর হেঁয়ালি সইতে পারছি না।"

"বন্ধু মৃগাঙ্ক, তুমি এখন রয়েছ কোথায় ?"

"হোটেলে।"

"হোটেলটা কোন শহরে ?"

"ভিয়েনতিয়ানে শহরে।"

"কিলোমিটার সিক্স এখান থেকে কি বেশি দূরে ?"

"কিলোমিটার সিক্স !"

"ছোটখাটো ক্যালিফোর্নিয়া শহর রে, আমেরিকানদের তৈরি। এখন ফেলে পালিয়েছে। এই তো সেদিন দেখে এলি।"

"তা দেখেছি। কিন্তু কিলোমিটার সিক্সে যাবি কেন ?"

পান্না-বুদ্ধরা সেখানে এসে উঠেছেন বলে।"

"ইন্দ্র ! ইন্দ্র ! আবার আমার মাথা ঘুরছে !"

"খবরদার ! অজ্ঞান হয়ে যাসনি। পান্না-বুদ্ধদের দেখতে হবে না ? ওই যে এসে গেছে গাড়ি।"

রেলিং-এ কনুই রেখে ঝুঁকে পড়ল ইন্দ্রনাথ। তিন তলার বারান্দা থেকে দেখলাম, হোটেলের ফটক পেরিয়ে কাঁকর বিছনো পথ মাড়িয়ে একটা ভীষণ দামি বিদেশী গাড়ি ঢুকল এবং ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল পোর্টিকোয় ঢুকে। দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার শব্দও শুনলাম। কিন্তু আরোহীকে দেখতে পেলাম না।

ইন্দ্রনাথ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে রহস্যময় হাসি হেসে, "হে বন্ধু, এইবার দেখতে পাবে এই অ্যাডভেঞ্চারের সব থেকে রোমাঞ্চকর নায়ককে।" বলেই কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে গেল লাউঞ্জে।

এখন যেসব ঘরকে কেতাদুরস্ত ভাষায় বলা হয় লাউঞ্জ, আগে তার নাম ছিল 'পারলার', ইংরেজি ভাষায়। আমরা বাঙালিরা সোজাসুজি যাকে বলি বৈঠকখানা, আসলে তাই। আমাদের এই লাউঞ্জখানা এমনই ঝকমকে কায়দায় সাজানো যে সেখানে দাঁড়িয়ে কেউ ভাবতেও পারবে না, এই হোটেলেই বোমা পড়েছিল মাত্র আট বছর আগে।

কাচের দরজার এপারে দাঁড়িয়ে আমি উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে রয়েছি পা থেকে মাথা পর্যন্ত। ওপারে, অর্থাৎ ঘরের মধ্যে ইন্দ্রনাথ। পুরু কার্পেট মাড়িয়ে কোঁচা দুলিয়ে ওদিককার দরজার সামনে যেই পৌঁছেছে, অমনি দরজা গেল খুলে।

হাসিমুখে ঘরে ঢুকল একজন বেঁটে পুরুষ। তার পরনে কালো আলখাল্লা। মাথায় নেপালি টুপি। চোখে কালো চশমা !

শেরপা থুঙ ! এই মূর্তিকেই তো দেখেছিলাম ওয়াট ফু বৌদ্ধমঠের পাথরের সিঁড়িতে। বাচ্চাছেলের মতো গুলতি ছুঁড়ে ফানুস-দানো ছুঁড়ে দিয়ে পিলে চমকে দিয়েছিল বোসবাবু বেচারির !

শেরপা থুঙ ! এরই ভয়ে কাঁটা হয়ে থেকেছেন বোসবাবু। হিল্লি-দিল্লি পালিয়ে বেড়িয়েছেন। অপঘাতে মারা গেলেন শেষকালে।

শেরপা থুঙ ! পাজির পাঝাড়া শেরপা থুঙ ! কিন্তু ইন্দ্রনাথ ওর সঙ্গে অত হেসে-হেসে করমর্দন করছে কেন ? আবার হাত তুলে দেখাচ্ছে আমাকে !

মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করছিল বলেই কাচের পাল্লা ঠেলে ঢুকতে পারিনি। তবে আমার টলায়মান অবস্থা দেখেই ছুটে এল ইন্দ্রনাথ। এক ঝটকায় পাল্লা খুলে আমাকে ভেতরে টেনে নিয়ে শুধু বললে স্নেহাক্ত গলায়, "বোকা।"

হাত বাড়িয়ে শেরপা থুঙ আমার মুঠো খামচে ধরে বললে খাঁটি ইংরেজিতে, "এতটা চমকে দিতে চাইনি, মিঃ রয়। দায়ী আপনার এই বন্ধু। উনিই বললেন একটা নাটক করা যাক। থ্রিলার-লেখক বন্ধুটাকে থ্রিল দিতে হবে শেষকালে। ভেরি সরি, ভেরি সরি..."

"বা-বা-বাট, হু আর ইউ ?" নাটকের ক্লাইম্যাক্সে এতটা কুপোকাত হব, ভাবতেই পারিনি।

"আই অ্যাম শেরপা থুঙ।"

"শেরপা থুঙ ! ভিলেন শেরপা থুঙ !"

এইবার অট্টহাসি হাসল ইন্দ্রনাথ। ওর সেই বিখ্যাত অট্টহাসি। দু'হাতে আমাকে আর শেরপা থুঙকে জড়িয়ে ধরে লম্বা ডিভানে বসতে-বসতে বললে, "তোর পিলে চমকে দেওয়ার জন্য আমিও ক্ষমা চাইছি। হ্যাঁ, ইনিই শেরপা থুঙ। এল·পি·আর·পি· মহলে ইনি এই নামেই বিখ্যাত। তবে ভিলেন হিসেবে নন, হিরো হিসেবে।"

মুচকি হেসে বললে শেরপা থুঙ, "রং চড়াবেন না, মিঃ রুদ্র।"

রঙের তাস আপনি, জ্যান্ত টেক্কা। মৃগাঙ্ক, ওরকম বোকার মতন তাকালে তোকে বিচ্ছিরি লাগে।"

ঢোক গিলে বললাম, "এল·পি·আর·পি· মানে ?"

"লাও পিপলস্ রিভোলিউশনারি পার্টি।"

"অ !"

"মৃগ, আদি কথা এবার খোলসা করা যাক। বোসবাবু যা কিছু

বলেছেন, সবই ঠিক। কিছু-কিছু বেঠিক কথা আছে, যা তিনি মনে-মনে কল্পনা করে নিয়েছেন এবং সত্যি বলেই ধরে নিয়েছেন। হ্যাঁ, ওঁর মামার বাড়ি ছিল শ্যামদেশে। ওঁর মা সত্যিকারের রাজকুমারী। দাদামশাই দেদার পান্না-বুদ্ধ সংগ্রহ করেছিলেন এবং সব ক'টাই লুকিয়ে রেখেছিলেন শ্যামদেশের বাইরে, এই লাওসে। কোথায়-কোথায় লুকনো আছে, তাও বোসবাবুর মা জানতেন এবং ঠিকানাগুলো বলে গিয়েছিলেন বোসবাবুর বাবাকে। বাবার মুখে সব শুনেছিলেন বোসবাবু। কিন্তু শেলশক্ খেয়ে সব ভুলে গিয়েছিলেন, শুধু কলসির মাঠের কথা ছাড়া।"

"শেলশক্?"

"বর্মায় যখন বোমা পড়ে, তখন ওঁর বাবা মারা যান। অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল বোসবাবুকে। লোকে বলে মাথা বিগড়ে গিয়েছিল তখন থেকেই। কিন্তু দূরের জিনিস চোখে দেখার ক্ষমতাটাও অর্জন করেন মাথায় চোট পাওয়ার পর থেকে।"

"সে কী!"

"মৃগ, বোসবাবু একটা চলমান বিস্ময়। মামাবাড়ির পান্না-বুদ্ধদের ঠিকানা ভুলে মেরে দিলেও তাই নিয়ে মুখ ফসকে কথা বলে ফেলতেন। দার্জিলিং থাকার সময়ে যাঁর কাছে বলেছিলেন, তিনিই এই শেরপা থুঙ। দেশের কাজে গিয়েছিলেন সেখানে। বোসবাবুর রকমসকম দেখে ওঁর সন্দেহ হয়, ওঁকে নিয়ে লাওস ঘুরলে হয়তো পান্না-বুদ্ধদের খুঁজে পাওয়া যাবে। অত টাকার জিনিস পেলে দেশের সম্পদ বাড়বে, এই আশায় ওঁকে নিয়ে আসেন এখানে। কিন্তু ব্যাঙ্কক থেকেই নিপাত্তা হয়ে যান বোসবাবু। সেই থেকেই উনি ওঁকে খুঁজছিলেন। কলকাতায় এসে আমাকে যেদিন ভার দিয়েছিলেন বোসবাবুকে খুঁজে বের করার, ঠিক সেইদিন বোসবাবু নিজেই এলেন আমার কাছে। একেই বলে কাকতালীয়, যা লাখে একবার ঘটে কি না সন্দেহ।"

দম বন্ধ করে শুনছিলাম। এবার বললাম, "সারা পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে শেরপা থুঙ কলকাতায় তোর কাছে এলেন কেন?"

"কারণ উনি খবর পেয়েছিলেন বোসবাবু এখন কলকাতায়। তাই ছুটে এসেছিলেন নিজেই। বোসবাবুর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন সিনেমা মার্কা করোটি দেখলেই লোকে শনাক্ত করে ফেলতে পারবে এই আশায় কাগজে-টিভিতে-রেডিওতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ভারও দিতেন আমাকে। কিন্তু তার আর দরকার হল না। বোসবাবু নিজেই হেঁটে ঢুকেছিলেন আমার ঘরে। উনি আসার ঠিক আগেই। তাই কথা বলতে বলতে ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠে পালিয়েছিলেন বোসবাবু। ওঁর মনে শেরপা থুঙ-এর ছবিই ভেসে উঠেছিল।"

"বোসবাবু তা হলে বুজরুক নন?"

"একেবারেই নন! শুধু যা মাথার স্ক্রুগুলো ঢিলে হয়ে গেছে। বোমাফাটার সাঙ্ঘাতিক আওয়াজে। তাই ওঁকে বারবার বোমা ফাটার আওয়াজ শোনানো হয়েছে, যাতে পালটা শক্ খেয়ে স্মৃতিশক্তি সব ফিরে আসে।"

"খুলে বল, ইন্দ্র, খুলে বল।"

"মৃগ, ওঁর মাকড়সা-ভীতি আছে ছেলেবেলা থেকেই। তাই ওঁকে মাকড়সার ভয় দেখিয়ে ধাতস্থ করতে চেয়েছিলেন শেরপা থুঙ, যদিও ওঁর এই ভয় দেখানো ট্রিটমেন্টের বিরোধী আমি। কিন্তু উনি মনে করেন, বিষে বিষক্ষয় নীতি মানসিক রোগেও কাজ দেয়।"

"আলবত দেয়," বলে উঠলেন শেরপা থুঙ।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাই বলে বর্জিয়ার মতো ধেড়ে মাকড়সাকে ঘরে ঢুকিয়ে বোসবাবুর আত্মারাম খাঁচাছাড়া করে দেওয়ার মানে হয় না।"

"ওরকম দামি মাকড়সাটাকে আপনিই বা গুলি করে উড়িয়ে দিলেন কী হিসেবে ?"

"কী আশ্চর্য ! যমদূতকে গুলি করব না তো কি রাবড়ি খাওয়াব ?"

"আরে মশাই, ওর ঠ্যাং-এ সুতো বাঁধা ছিল। যথাসময়ে টেনে বের করে নিতাম। কিন্তু এমন গুলি করলেন..."

"লাশটা টেনে নিয়ে গেছেন ?"

"অগত্যা," ঘাড় নাচিয়ে বললেন শেরপা থুঙ।

শুনছিলাম আর মনের মধ্যে লিস্ট তৈরি করছিলাম পরের পর ঘটে যাওয়া রহস্যগুলোর। দুই মক্কেল নিস্তব্ধ হতেই ছুঁড়ে দিলাম প্রশ্নগুলো ? ফটাফট জবাব দিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ।

আমি: মাছের পুকুরে বোমা ফাটল কি আপনা হতেই ?

ইন্দ্রনাথ: না। ইলেকট্রিক ডিটোনেটর দিয়ে ফাটানো হয়েছিল দূর থেকে। শেরপা থুঙ ছায়ার মতো ছিলেন আমাদের সঙ্গে। ওঁর লোকজন কলকাঠি নেড়ে গেছে আগে থেকেই।

আমি সোনা-চড়ায় জালার মধ্যে অত মাকড়সা এল কীভাবে ?

ইন্দ্রনাথ: রেখে দেওয়া হয়েছিল আগে থেকেই। বোসবাবু মনের মধ্যে ঠিক ছবিই দেখেছিলেন, বিশেষ ওই জালার মধ্যে লুকনো ছিল সাতটা পান্না-বুদ্ধ। চড়ায় আমরা পৌঁছনোর আগেই তন্নতন্ন করে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল জালাটা। সোনা খুঁজছিল যে ছেলে আর মেয়েটি, ওরা শেরপা থুঙ-এর চর।

আমি বটে ! বটে কিন্তু কলসির মাঠে দো-বোমা ফাটল কেন ?

ইন্দ্রনাথ মাঠ জুড়ে তখন তল্লাসি চলছে প্রতিটি কলসির মধ্যে। বোসবাবু যাতে বাগড়া দিতে না পারেন, তাই ভয় দেখানো হয়েছিল দো-বোমা ফাটিয়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি মনের টানে ফের গেলেন রাতে। তখন হাইড্রোজেন গ্যাসভর্তি বেলুন ওড়ানো হয়েছে শূন্যে। তাতে ফসফরাস রং দিয়ে আঁকা ছিল দানো-মূর্তি। নীচ থেকে আলো ফেলায় তা অত ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল। বিকট হাসি হেসেছেন শেরপা থুঙ নিজে।

আমি বিটকেল বুদ্ধির আধার উনি। ওয়াট ফু মঠে গুলতি ছুঁড়ে দানো ভাসানোর প্রয়োজন ছিল কি ?

ইন্দ্রনাথ ওখানে বোসবাবুর নামবার আর দরকার ছিল না। ব্যাঙ্ককের আসল পান্না-বুদ্ধকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল মঠের পাতালঘরে। তাই গুলতি করে হাইড্রোজেন ক্যাপসুল ছুঁড়েছিলেন উনি। বেলুন ফুলে উঠতেই...

আমি তুই বিরক্ত হয়ে গুলি করেছিলি। ওইভাবে বোসবাবুকে অজ্ঞান করাটা ঠিক হয়নি। ম্যাজিক-গাছের তলায় নাকি পান্না-বুদ্ধ আছে, বোসবাবুর এই কথাও কি সত্যি ?

ইন্দ্রনাথ নির্জলা সত্যি। বিষে বিষক্ষয় ঘটেছিল নিশ্চয়। আঘাতের পর আঘাতে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল ওঁর মনের ছবি। ম্যাজিক-গাছের ফল সম্পর্কে গল্পটা লাওসের কিংবদন্তি। ইচ্ছে করলেও কেউ ও দ্বীপে যেতে পারে না। তাই বোসবাবুর দাদামশাই বারোটা পান্না-বুদ্ধ পুঁতে রেখেছিলেন গাছের গোড়ায়।

আমি মাই গড ! সাপের বিছানায় শোয়া বুদ্ধর তলাতেও কি পাওয়া গেছে পান্না-বুদ্ধ ?

ইন্দ্রনাথ নিশ্চয়। মোট কুড়িটা।

আমি পাইথনের মাথা উড়ে গেল কার বুলেটে ? তোর, না, শেরপা থুঙের ?

ইন্দ্রনাথ তিনটের দুটো বুলেট আমার, একটা শেরপা থুঙের।

আমি কোথায় আছেন তাঁরা ?

ইন্দ্রনাথ পান্না-বুদ্ধরা তো ? সেখানে তোকে নিয়ে যেতেই এসেছেন শেরপা থুঙ। চলুন...

উঠে দাঁড়ালেন শেরপা থুঙ, "হ্যাঁ চলুন।"

শেরপা থুঙ-এর শেষ কৌশল

ক্যালিফোর্নিয়া শহর জীবনে দেখিনি। তবে হ্যাঁ, কিলোমিটার সিক্স শহর দেখে মাথা ঘুরে গেল। এশিয়ার বুকে আমেরিকান ঐশ্বর্য আর ঐতিহ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেখানকার পথেঘাটে, মাঠে-বাড়িতে। তাক লেগে যায়।

সব ফেলে রেখেই দেশে ফিরেছে আমেরিকানরা। এখন তাকে কাজে লাগিয়েছে এল·পি·আর·পি·। সদর ঘাঁটি সেখানেই, সশস্ত্র রক্ষী মোতায়েন পথের মোড়ে-মোড়ে, বাড়িতে-বাড়িতে।

পরিত্যক্ত একটা হাই স্কুল জিমনাশিয়ামের সামনে এসে দাঁড়াল আমাদের ঝলমলে গাড়ি।

শেরপা থুঙের খাতির দেখলাম বটে সেখানে। গাড়িতে বসেই কালো আলখাল্লা আর মাথার টুপি খুলে ফেলেছিলেন। গাড়ি থেকে নেমে এলেন খাঁটি বিলিতি পোশাকে।

তারপর শেষ ম্যাজিক দেখালেন রহস্যময় এই ভদ্রলোক।

কত গলিঘুঁজি পেরিয়ে যে সেখানে পৌঁছেছিলাম, তা বলা সম্ভব নয়। ঘুরতে-ঘুরতে যখন মাথা ঘুরছে, তখন আমরা থমকে দাঁড়ালাম একটা সোনালি দরজার সামনে।

বিশাল পাল্লা। দু'মানুষ সমান উঁচু। দু'পাশে অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে রক্ষী।

পকেট থেকে চাবি বের করে তালার ফুটোয় লাগালেন শেরপা থুঙ। মোচড় মেরে পাল্লায় আলতো চাপ দিতেই ফাঁক হয়ে গেল এক ইঞ্চির মতো।

ফাঁক দিয়ে ঠিকরে এল নীলাভ আলোর ছটা। অপূর্ব সেই নীলদ্যুতির বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। চোখ ধাঁধায় না, চোখ জুড়িয়ে যায়। ঘরের মধ্যে নীল আলো জ্বলছে ঠিকই, কিন্তু এ-শুধু বৈদ্যুতিক দ্যুতি নয়... এর সঙ্গে মিশে রয়েছে পান্নার আভা। মুহ্যমানের মতো চেয়েছিলাম এক ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে ঠিকরে আসা আলোর ঢেউ-এর দিকে। পেছন থেকে আলতো ঠেলা মেরে মৃদু কোমল স্বরে বললেন শেরপা থুঙ, "ভেতরে যান।"

যেন স্বপ্নের ঘোরে ঢুকলাম নীলাভ দ্যুতির মধ্যে দিয়ে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল পেছনে। আমি দেখলাম তাঁদের।

বড় ঘর। কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে নীলাভ ঝাড়বাতি। ঘরের তিন দিকে গ্যালারি। তিনটে তাক। প্রতিটি তাকে সারিসারি পান্না-বুদ্ধ। রকমারি তাঁদের সাইজ। হরেকরকম তাঁদের ভঙ্গি। কিন্তু প্রতিটিই অনন্য, অপূর্ব, শিল্পীর অসামান্য ক্ষমতার নিদর্শন।

আমি বিহ্বল চোখে যখন দেখছি এঁদের, এই পান্না-বুদ্ধদের, এমন সময়ে কে যেন হাত রাখল আমার কাঁধে। বললে ফিসফিস করে, "আমি ভাল হয়ে গেছি মৃগাঙ্কবাবু।"

চেনা গলা। তাই বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের হাতে গড়া দৈত্যর মতো ঘাড় কাত করে হা-হা হেসে বলেছিলেন তিনি, "আরে ! আরে ! চোখ কপালে তুলছেন কেন ? আমি ভূত নই, ভূত নই, জ্যান্ত বোসবাবু। মরিনি মেকং-এর জলে। শেরপা থুঙ-এর চরগুলো এত ওস্তাদ আগে যদি জানতাম। যাচ্চলে !"

তারপর আর কিছু মনে নেই ! (সমাপ্ত)

ছবি : বিমল দাস

সমাপ্ত
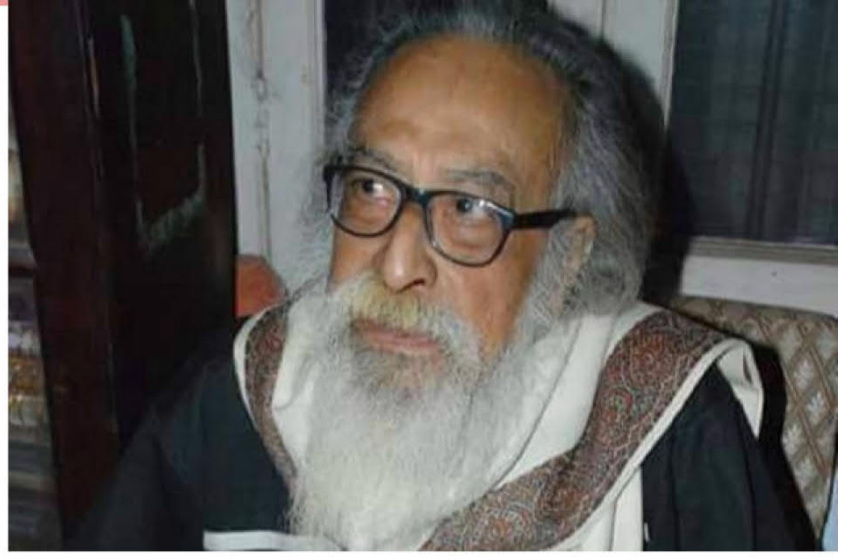
'কল্পবিজ্ঞান' শব্দবন্ধটার স্রষ্টাও তিনি। শুধু সাহিত্যের আকারে বাঙালিকে কল্পবিজ্ঞান পড়তে শেখানোই নয়, তিনি বাঙালি পাঠক-পাঠিকার মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা জাগিয়ে তোলার কাজেও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। সোমবার গভীর রাতে প্রয়াত হলেন অদ্রীশ বর্ধন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

দীর্ঘদিন ধরেই বয়সজনিত নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। বস্তুত বাংলাতেও যে বিজ্ঞানচর্চা হতে পারে কিংবা বিজ্ঞানে বাংলার অবদানের কথা বারবার তাঁর কলমে উঠে এসেছে। অদ্রীশ বর্ধনের লেখার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল, বহু কঠিনতম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকেও তিনি সাহিত্যগুণের মাধ্যমে অত্যন্ত সরল, সহজ করে তুলতেন পাঠকদের কাছে।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র তো বটেই, অদ্রীশ বর্ধন জন্ম দিয়েছিলেন কত সব মায়াবী চরিত্রের। ফাদার ঘনশ্যাম, জিরো গজানন, চাণক্য চাকলা, নারায়ণী ও ইন্দ্রনাথ রুদ্রর মতো চরিত্র বাঙালির কাছে হয়ে উঠেছিল হটকেক।

কল্পবিজ্ঞান নিয়েই তাঁর কার্যকলাপ মূলত ঘোরাফেরা করলেও অদ্রীশ বর্ধন কিন্তু গোয়েন্দা চরিত্রও নির্মাণ করেছেন একের পর এক। ইন্দ্রনাথ রুদ্র তার উজ্জ্বল নিদর্শন। এছাড়াও অনুবাদ করেছেন বহু বিদেশী সাহিত্যও।

ছবি সুব্রত [illegible]